বিদ্যাসাগর (যৌবনে)

বিদ্যাসাগর-চরিত

"রাজর্ষি রামমোহন,"
"মহাত্মা অশ্বিনীকুমার," "বৌদ্ধ-ভারত," "ভারতীয় সাধক," "শিখগুরু ও
শিখজাতি," "বুদ্ধের জীবন ও বাণী," "পঞ্চকন্যা," "শিবাজী ও
মারাঠাজাতি," "বঙ্গগৌরব স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,"
প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা—

শ্রীশরৎকুমার রায়

রায় এণ্ড কোং
পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক
২২০ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
১৩৪১

মূল্য এক টাকা মাত্র

উৎসর্গ

যিনি মহৎ

সকল দেশের সকল জাতির

মহাজনদের প্রতি

যাঁহার অন্তরে অসীম অনুরাগ ছিল

সেই পরলোকগত সাধু-ভক্ত

ভাই প্রমথলাল সেন মহাশয়ের

পুণ্যময় নামে

এই চরিতগ্রন্থখানি সাদরে

উৎসর্গ করা হইল

১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪১
কলিকাতা

প্রণত
গ্রন্থকার

নিবেদন

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্র বাঙ্গালীর জাতীয় সম্পত্তি। এই মহৎ চরিত্রের অনির্ব্বাণ জ্যোতিঃ চিরদিন বাঙ্গালীকে আশা ও অভয় দান করিবে। তিনি কেবল বিদ্যা ও দয়ার সাগর ছিলেন না; তাঁহার চরিত্র সাগরের মত বিরাট্, অনন্ত ও অসংখ্য রত্নের আকর ছিল। এমন চরিত্রের আলোচনা কোনকালেই শেষ হইতে পারে না। এই মহাজনের শ্রীচরণে নরনারী বর্ষে বর্ষে ভক্তির নূতন অর্ঘ্য প্রদান করিবে। এই ছোট পুস্তকখানি বাঙ্গালী জাতির পিতৃকল্প এই মহাত্মার চরণকমলে দীন গ্রন্থকারের ভক্তিপূর্ণ অকিঞ্চিৎকর অর্ঘ্য।

এই পুস্তকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের জ্ঞাতব্য সকল ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তক-প্রণয়নে পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়দের লিখিত প্রবন্ধ; ৺চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারীলাল সরকার মহাশয়দের প্রণীত 'বিদ্যাসাগর'; ৺রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত পুস্তকাবলী হইতে বহু সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। পূর্ব্বোক্ত সাহিত্যসেবী মহাশয়দের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪১ }
কলিকাতা }

বিনীত
গ্রন্থকার

সূচীপত্র

জননী ভগবতী দেবী

১পৃঃ)

বিদ্যাসাগর-চরিত

প্রথম অধ্যায়

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্র-মাহাত্ম্য বর্ণনার প্রারম্ভে সুপণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলিয়াছেন—

"রত্নাকরের রাম-নাম উচ্চারণে অধিকার ছিল না। অগত্যা 'মরা মরা' বলিয়া তাঁহাকে উদ্ধার লাভ করিতে হইয়াছিল। এই পুরাতন পৌরাণিক নজীরের দোহাই দিয়া আমাদিগকেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। নতুবা ঐ নাম গ্রহণ করিতে আমাদের কোন-রূপ অধিকার আছে কি না, এ বিষয়ে ঘোর সংশয় আরম্ভেই উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। বস্তুতঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা যে, তাঁহার নামগ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম স্পর্দ্ধার

কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বাগ্‌যত, কর্ম্মনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও আমাদের মত বাক্‌সর্ব্বস্ব সাধারণ বাঙ্গালী, উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান।”

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃতির দুর্দ্দমতা, অনম্যতা ও তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণাবলীর আলোচনা করিয়া ত্রিবেদী মহাশয় বলিয়াছেন—“বঙ্গদেশে এমন চরিত্রের আবির্ভাব একটা ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ পিতৃপিতামহ হইতে তাঁহার ধাতুতে, মজ্জাতে ও শোণিতে এমন একটা পদার্থ তিনি পাইয়াছিলেন, যাহাতে সমুদয় বিপত্তি ভিন্ন করিয়া তিনি বীরের মত রণক্ষেত্রে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুঃখ অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে; জীবনের বন্ধুর পথ অনেকের পক্ষেই কণ্টকসমাবেশে ভয়ানক দুর্গম; কিন্তু বিদ্যাসাগরের মত সেই কাঁটাগুলিকে ছাঁটিয়া দলিয়া চলিয়া যাইতে অল্প লোককেই দেখা যায়। বাঙ্গালীর মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত প্রকৃতই বিরল।”

“অথচ বিদ্যাসাগর একজন খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি খাঁটি বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বাল্য-জীবনে ইউরোপীয় প্রভাব তিনি কিছুই অনুভব করেন নাই। তিনি যে স্থানে, যাঁহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, সেস্থানে তাঁহাদের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবের প্রভাব তখন পর্য্যন্ত একেবারেই প্রবেশলাভ করে নাই। পরজীবনে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য দীক্ষা অনেকটা পাইয়াছিলেন,

অনেক পাশ্চাত্যের স্পর্শে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে যে তাঁহার চরিত্রকে কোনরূপ পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। তাঁহার চরিত্র তাহার পূর্ব্বেই সম্যগ্‌ভাবে সম্পূর্ণরূপে গঠিত হইয়াছিল; আর নূতন মশলা-সংগ্রহের প্রয়োজন হয় নাই। যে বৃদ্ধ বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সহিত আমরা এত পরিচিত, যে বালক ঈশ্বরচন্দ্র পরের ক্ষেতে যবের শীষ খাইতে গিয়া গলায় কাঁটা ফুটাইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, অথবা আহারকালে পার্শ্ববর্ত্তীদের ঘৃণার উদ্রেকভয়ে নিজের পাকস্থলীতে আরশুলার ন্যায় বিকট জন্তু প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই বালক বিদ্যাসাগরেই সেই চরিত্রের সম্পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়।"

"বিদ্যাসাগর যদি ইংরাজী একেবারে না শিখিতেন, ইংরাজের স্পর্শে একেবারে না আসিতেন, চিরকালই যদি তিনি সেই নিভৃত বীরসিংহ গ্রামের টোলখানিতে ব্যাকরণের তাৎপর্য্য-আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, তাহা হইলে ১৩০৩ সালের ১৩ই শ্রাবণ তারিখে মৃত্যুদিনে কলিকাতা সহরের অবস্থাটি যেমন হইয়াছিল ঠিক্ তেমনিটি না হইতে পারিত; কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র আপন প্রকাণ্ড পুরুষসিংহত্ব লইয়া আপনার পল্লীগ্রামখানিকে বিক্ষোভিত রাখিতেন, সন্দেহ নাই। তিনি ঠিক যেমন বাঙ্গালীটি হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, শেষ দিন পর্য্যন্ত তেমন বাঙ্গালীটিই ছিলেন। পাশ্চাত্য চরিত্রের সহিত তাঁহার চরিত্রের যে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়, সে সমস্তই তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি, অথবা

তাঁহার পুরুষানুক্রমে আগত পৈত্রিক সম্পত্তি। ইহার জন্য তাঁহাকে কখনও ঋণ স্বীকার করিতে হয় নাই।”

সুকবি ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রকে “বীরসিংহের সিংহ-শিশু” বলিয়াছেন। বাঙ্গলা ১২২৭ অব্দের ১২ই আশ্বিন মেদিনীপুর জিলার বীরসিংহ গ্রামে এই সিংহশিশু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতার নাম ভগবতী দেবী। তাঁহার পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ মহাশয় অসামান্য ব্যক্তি ছিলেন; তিনি জন্মদিনেই এই শিশুর বিশিষ্টতা-সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের যে-সময়ে জন্ম হয় সেই সময় পিতা ঠাকুরদাস ঘরে ছিলেন না। তিনি জিনিষ কিনিতে কোমরগঞ্জের হাটে গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময়ে পথে রামজয়ের সহিত ঠাকুর-দাসের দেখা হয়। রামজয় তাঁহাকে বলিলেন—“আজ আমাদের একটা এঁড়ে বাছুর হইয়াছে।” বাড়ীতে একটা গাভীর বাছুর হইবার সম্ভাবনা ছিল, ঠাকুরদাস ঘরে ফিরিয়া বাছুর দেখিবার জন্য গোয়ালঘরের দিকে যাইতেছিলেন। রামজয় তাঁহাকে ফিরিতে বলিয়া আতুর ঘরের নিকটে লইয়া গেলেন। তিনি শিশু ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখাইয়া বলিলেন—“এই শিশু এঁড়ে বাছুরের মত একগুঁয়ে হইবে, এই শিশু আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করিবে।” পিতামহের এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সফল হইয়াছে। পিতামহই এই শিশুর নাম রাখিলেন ‘ঈশ্বরচন্দ্র’।

পিতামহ

আত্মজীবনীতে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার পিতামহসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"আমার পিতামহদেব রামজয় তর্কভূষণ কোন কারণে বনমালিপুরের পৈত্রিক বাস-ভবন ত্যাগ করিয়া নিতান্ত অনিচ্ছায় বীরসিংহগ্রামে শ্যালক-ভবনে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি নিরতিশয় তেজস্বী ছিলেন; কোন অংশে কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিতে, অথবা কোনও প্রকারে, অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি সকল স্থলে, সকল বিষয়ে, স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন। অন্যের অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তন তাঁহার স্বভাব ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। উপকার প্রত্যাশায়, অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি কখনও পরের উপাসনা বা আনুগত্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য করা অপেক্ষা প্রাণ ত্যাগ করা ভাল। তিনি নিতান্ত নিস্পৃহ ছিলেন, এজন্য অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য, তাঁহার পক্ষে কস্মিন্ কালেও, আবশ্যক হয় নাই।"

"তর্কভূষণ মহাশয় নিরতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন; কি ছোট, কি বড় সর্ব্ববিধ লোকের সহিত, সমভাবে সদয় ও সাদর ব্যবহার করিতেন। তিনি যাঁহাদিগকে কপট মনে করিতেন, তাঁহাদের সহিত সাধ্যপক্ষে আলাপ করিতেন না।

তিনি যেমন স্পষ্টবাদী, তেমনিই যথার্থবাদী ছিলেন। কাহারও ভয়ে বা অনুরোধে, অথবা অন্য কোন কারণে তিনি কাহারও কোন বিষয়ে অযথা নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনি যাঁহাদিগকে আচরণে ভদ্র দেখিতেন, তাঁহাদিগকেই ভদ্রলোক বলিয়া গণ্য করিতেন ; আর যাঁহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, বিদ্বান্, ধনবান্ ও ক্ষমতাপন্ন হইলেও, তাঁহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন বটে, কিন্তু তাঁহার আকারে, আলাপে বা কার্য্যে তাঁহার ক্রোধ জন্মিয়াছে বলিয়া, কেহ বোধ করিতে পারিতেন না। তিনি ক্রোধের বশীভূত হইয়া, কাহারও প্রতি কটূক্তিপ্রয়োগে অথবা কাহারও অনিষ্টচিন্তনে কদাচ প্রবৃত্ত হইতেন না। নিজে যে কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারা যায়, তাহাতে তিনি কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা করিতেন না ; এবং কোনও বিষয়ে, সাধ্যপক্ষে পরাধীন বা পরপ্রত্যাশী হইতে চাহিতেন না।”

“তিনি একাহারী, নিরামিষাশী, সদাচার-পূত ও নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মে সবিশেষ অবহিত ছিলেন। এজন্য সকলেই তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঋষি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। বনমালিপুর হইতে প্রস্থান করিয়া যে আট বৎসর তিনি নিরুদ্দেশপ্রায় হইয়াছিলেন, ঐ আট বৎসরকাল কেবল তীর্থ-পর্য্যটনে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি দ্বারকা, জ্বালামুখী, বদরিকাশ্রম পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়াছিলেন।”

"তর্কভূষণ মহাশয় অতিশয় বলবান্, নিরতিশয় সাহসী এবং সর্ব্বতোভাবে অকুতোভয় পুরুষ ছিলেন। এক লৌহদণ্ড তাঁহার চিরসহচর ছিল। উহা হস্তে না করিয়া তিনি কখনও বাটীর বাহির হইতেন না। তৎকালে পথে অতিশয় দস্যুভয় ছিল। স্থানান্তরে যাইতে হইলে অতিশয় সাবধান হইতে হইত। অনেক স্থলে কি প্রত্যূষে, কি মধ্যাহ্নে, কি সায়াহ্নে, অল্পসংখ্যক লোকের প্রাণনাশ অবধারিত ছিল। এজন্য অনেকে সমবেত না হইয়া, ঐ সকল স্থল দিয়া যাতায়াত করিতে পারিতেন না। তর্কভূষণ মহাশয় অসাধারণ বল, সাহস ও চিরসহচর লৌহদণ্ডের সহায়তায় সকল সময়ে ঐ সকল স্থল দিয়া একাকী নির্ভয়ে যাতায়াত করিতেন। দস্যুরা দুই চারিবার তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু উপযুক্তরূপ আক্কেল সেলামি পাইয়া, আর তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সাহসী হইত না।"

"মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক,বন্য হিংস্র জন্তুকেও তিনি ভয়ানক জ্ঞান করিতেন না। একুশ বৎসর বয়সে, তিনি একাকী মেদিনীপুর যাইতেছিলেন। তৎকালে ঐ অঞ্চলে অতিশয় জঙ্গল ও বাঘভালুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর ভয়ানক উপদ্রব ছিল। একস্থলে খাল পার হইয়া, তীরে উত্তীর্ণ হইবামাত্র, ভালুকে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। ভালুক নখর-প্রহারে তাঁহার সর্ব্বশরীর ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিল, তিনিও অবিশ্রান্ত লৌহযষ্টি দ্বারা উহাকে প্রহার করিতে

লাগিলেন। ভালুক ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িল, তিনি তদীয় উদরে উপর্য্যুপরি পদাঘাত করিয়া তাহার প্রাণসংহার করিলেন। এইরূপে এই ভয়ঙ্কর শত্রুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইলেন বটে, কিন্তু তৎকৃত ক্ষতদ্বারা তাঁহার শরীরের শোণিত অনবরত বিনির্গত হওয়াতে, তিনি নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই স্থান হইতে মেদিনীপুর প্রায় চারি ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত। ঐ অবস্থাতে তিনি অনায়াসে পদব্রজে, মেদিনীপুরে পঁহুছিলেন। এক আত্মীয়ের বাসায়, দুই মাস কাল শয্যাগত থাকিলেন এবং ক্ষত সকল সম্পূর্ণ শুষ্ক হইলে, বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। ঐ সকল ক্ষতের চিহ্ন মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার শরীরে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইত। তিনি ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।”

ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার এই তেজস্বী পিতামহের নিকট হইতে কি পাইলেন, এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—“এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার পৌত্রকে আর কোন সম্পত্তি দান করিতে পারেন নাই, কেবল যে অক্ষয় সম্পদের উত্তরাধিকার বণ্টন একমাত্র পরমেশ্বরের হস্তে সেই চরিত্রমাহাত্ম্য অখণ্ডভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্রের অংশে রাখিয়া গিয়াছেন।”

পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

দারিদ্র্যের আগুনে পুড়িয়া পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও খাঁটি সোণার মানুষ হইয়াছিলেন। দরিদ্রতার

প্রবল পেষণ কেমন করিয়া প্রসন্নমনে সহ্য করিতে হয় ঠাকুরদাস তাঁহার সুবিখ্যাত পুত্রের সম্মুখে উহারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। দরিদ্রতার আলোকে তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি উজ্জ্বল এবং ধর্ম্মবুদ্ধি বিকশিত হইয়াছিল।

ঠাকুরদাসের পিতা বিরাগী হইয়া গৃহত্যাগ করিবার পরে তাঁহার মাতা দুর্গাদেবী বীরসিংহ গ্রামে পিত্রালয়ে একখানি ছোট কুটীরে দুইপুত্র ও চারিকন্যা লইয়া বাস করিতেন। চরকার সূতা কাটিয়া যাহা আয় হইত উহা দিয়া কোনরূপে দিনপাত করিতেন। ঠাকুরদাস মাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। মাতা দুর্গাদেবীর দুঃখে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইত। তাঁহার বয়স যখন চৌদ্দ কি পনর তখনই তিনি মাতার আদেশ লইয়া তাঁহার দুঃখমোচনের উদ্দেশ্যে চাকুরী করিবার জন্য কলিকাতায় আসেন। তাঁহার জ্ঞাতিপুত্র সুপণ্ডিত সহৃদয় জগন্মোহন ন্যায়ালঙ্কার তাঁহাকে নিজবাসায় আশ্রয় দিয়াছিলেন। ঠাকুরদাস পূর্ব্বেই "সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ" পড়িয়াছিলেন। এখন এই পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইল। কিন্তু দরিদ্র ঠাকুরদাসের এই ইচ্ছা পূর্ণ হইল না।

তখন সামান্য কিছু ইংরাজী জানিলে সওদাগরী আফিসে অল্প বেতনে চাকুরী পাওয়া যাইত। এইজন্য তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে এক জাহাজ সরকারের নিকট ইংরাজী শিখিতে যাইতেন। যখন ফিরিতেন তখন বাসার উপরি

লোকের খাওয়া শেষ হইত বলিয়া তিনি অনাহারে থাকিতেন। তাঁহার শরীর দিন দিন রোগা হইয়া যাইতে লাগিল। একদিন তাঁহার শিক্ষক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠাকুরদাস, তুমি দিন দিন এমন শুকাইয়া যাইতেছ কেন ?" চোখের জলে ঠাকুরদাসের বুক ভাসিয়া গেল। তিনি কোন উত্তর দিতে পারিতেছিলেন না। অবশেষে শিক্ষক মহাশয়ের পীড়াপীড়িতে তিনি বলিলেন—"মহাশয়, ইংরাজী পড়ার আরম্ভ কাল হইতে এ পর্য্যন্ত আমি এক বেলা আহার করিতেছি। আমি যখন বাসায় ফিরি তখন আমার আশ্রয়দাতার বাড়ীর উপরি লোকের খাওয়া শেষ হইয়া যায়।" শিক্ষক মহাশয়ের এক আত্মীয় ঠাকুরদাসকে আশ্রয় দিলেন। সেখানে ঠাকুরদাস রান্না করিয়া দুই বেলা খাইতেন। কিছুদিন ঠাকুরদাস নিশ্চিন্ত মনে লেখা-পড়া করিলেন। কিন্তু "অভাগা যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়।" হঠাৎ তাঁহার আশ্রয়দাতা ভদ্র লোকটির অবস্থা এমন হইল যে, তাঁহারই দিন চলা ভার হইয়া উঠিল। এই সময় কোন কোন দিন ঠাকুরদাস সমস্ত দিন উপবাসী থাকিতেন। একদিন উপবাসী ঠাকুরদাস শেষবেলায় ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হইয়া ঘরের বাহির হইলেন। তিনি অন্যমনস্কভাবে বড় বাজারের আশ্রয়দাতার বাসা হইতে ঠন্‌ঠনিয়া পর্য্যন্ত আসিয়া অবসন্ন হইয়া পড়েন। এই অবস্থায় এক বিধবার মুড়িমুড়কির দোকানের সম্মুখে তিনি দাঁড়াইয়া

ছিলেন। বিধবা সস্নেহে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা ঠাকুর, দাঁড়াইয়া আছ কেন?" ঠাকুরদাস একটু জল চাহিলেন। বিধবা জল ও তাহার সঙ্গে সামান্য কিছু মুড়কি দিলেন। ঠাকুরদাস যেমন আগ্রহের সহিত মুড়কি কয়টি খাইলেন উহা দেখিয়া বিধবা বলিলেন—"বাবা ঠাকুর, আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নাই?" ঠাকুরদাস বলিলেন—"না, মা, আজ কিছু খাই নাই।" তখন বিধবা নিকটস্থ গোয়াল দোকান হইতে দই আনিয়া দই ও মুড়কি দিয়া ঠাকুরদাসকে ফলার করাইলেন। যাওয়ার সময়ে বিধবা ঠাকুরদাসকে এই অনুরোধ জানাইলেন—"দেখ, যে দিন তোমার খাওয়া না হ'বে সে দিন উপোস করিয়া থাকিওনা, আমার এখানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইও।" আত্মজীবনীতে ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়াছেন—"পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়বিদারক উপাখ্যান শুনিয়া আমার অন্তঃকরণে যেমন দুঃসহ দুঃখানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, স্ত্রীজাতির উপর তেমনি প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল।"

ইহার পরে আশ্রয়দাতার সাহায্যে ঠাকুরদাস মাসিক দুইটাকা বেতনে একটি কাজ পাইলেন। এই সংবাদ পাইয়া মাতা দুর্গাদেবীর আনন্দের সীমা ছিল না। ঠাকুরদাস কলিকাতায় কষ্ট করিয়া থাকিতেন, বেতনের টাকা দুইটি মাসে মাসে বাড়ীতে মাতাকে পাঠাইয়া দিতেন। ঠাকুরদাস দৃঢ়চিত্ত, শ্রমপটু ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন বলিয়া কখনও

প্রভুর বিরাগভাজন হন নাই। দুই তিন বৎসর মধ্যে তাঁহার মাসিক বেতন পাঁচ টাকা, পরে আট টাকা হইল। এই সময়ে গোঘাট-নিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশ মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

জননী ভগবতীদেবী

ঈশ্বরচন্দ্রের জননী ভগবতীদেবী বঙ্গদেশের এক অখ্যাত পল্লীবাসিনী নারী। পুঁথিপড়া বিদ্যায় তিনি বিদুষী ছিলেন না। তথাপি এই মহীয়সী মহিলাকে আমরা অশিক্ষিতা বলিতে কুণ্ঠিত। ঔদার্য্য, বিনয়, শিষ্টাচার, সৌজন্য, দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণাবলীর বিকাশে ভগবতী দেবীর চরিত্র আকর্ষণের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার স্নেহপ্রীতি সূর্য্যকিরণের মত জাতিবর্ণনির্ব্বিচারে প্রতিবেশী নরনারী সকলের উপর এমনভাবে পতিত হইত যে, তাহাদের প্রত্যেকেই মনে করিত যে, ভগবতী দেবী তাহাকেই অন্য সকলের অপেক্ষা অধিক ভালবাসেন। দৈহিক রূপলাবণ্য এবং মানসিক সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব বিকাশে এই নারী মূর্ত্তিমতী দেবী বলিয়া বিবেচিত হইতেন।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"বঙ্গদেশের সৌভাগ্যক্রমে ভগবতী দেবী এক অসামান্যা রমণী ছিলেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত "বিদ্যাসাগর" গ্রন্থে লিথোগ্রাফ্‌পটে এই দেবীমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকাংশ প্রতিমূর্ত্তিই অধিকক্ষণ দেখিবার দরকার হয় না। তাহা যেন

মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। তাহা নিপুণ হইতে পারে, সুদূর হইতে পারে, তথাপি তাহার মধ্যে চিত্তনিবেশের যথোচিত স্থান পাওয়া যায় না। চিত্রপটের উপরিতলেই দৃষ্টির প্রসার পর্য্যবসিত হইয়া যায়। কিন্তু ভগবতী দেবীর এই পবিত্র মুখশ্রীর গভীরতা এবং উদারতা বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়াও শেষ করিতে পারা যায় না। উন্নত ললাটে তাঁহার বুদ্ধির প্রসার, সুদূরদর্শী স্নেহবর্ষী আয়ত নেত্র, সরল সুগঠিত নাসিকা, দয়াপূর্ণ ওষ্ঠাধর, দৃঢ়তাপূর্ণ চিবুক, এবং সমস্ত মুখের একটি মহিমময় সুসংযত সৌন্দর্য্য দর্শকের হৃদয়কে বহু দূরে এবং উর্দ্ধে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায় এবং ইহাও বুঝিতে পারি ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনের জন্য কেন বিদ্যাসাগরকে মাতৃদেবী ব্যতীত অপর কোন পৌরাণিক দেবী-প্রতিমার মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয় নাই।”

ধর্ম্মনিষ্ঠ গৃহীর পরিবারের মধ্যে প্রতিপালিত হইবার সৌভাগ্য ভগবতী দেবী পাইয়াছিলেন। পারিবারিক ধর্ম্মভাব তাঁহার বুদ্ধি, মন ও হৃদয়ের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আত্মসুখ খর্ব্ব করিয়া পরের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিবার সুশিক্ষা তিনি এইখানেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনেই তাঁহার মন সন্তুষ্ট হইত। ধর্ম্মপ্রাণ মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গৃহে অবস্থানকালে ভগবতী দেবী তেওর, বাগ্‌দী প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর নানা সম্প্রদায়ের প্রতিবেশিনী সমবয়স্কাদিগের সহিত খেলা

করিতেন। এই সকল সঙ্গিনীর সহিত তাঁহার এমন প্রগাঢ় সখীত্ব জন্মিত যে, অনেকে তাঁহার অদর্শন সহ্য করিতে পারিত না। সঙ্গিনীদের দুঃখের কথা শুনিয়া ভগবতী দেবী অশ্রুমোচন করিতেন। তিনি যে সকল সুমিষ্ট খাদ্য পাইতেন সেই সকলের অংশ তাহাদিগকে দিতেন। তাহাদের সহিত নানাপ্রকার গল্প করিয়া তিনি অতুল আনন্দ অনুভব করিতেন।

ভগবতী দেবীর বয়স যখন নয় বৎসর তখন মেদিনীপুর জিলার বীরসিংহগ্রামনিবাসী রামজয় তর্কভূষণ মহাশয়ের পুত্র ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

প্রথম যৌবনে ভগবতী দেবী এই দারিদ্র্যের মধ্যে পতি-গৃহে আগমন করেন। এইখানে অস্বচ্ছলতার মধ্যে তিনি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট চিত্তে অনলসভাবে গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিতেন। তাঁহার শ্রদ্ধাপূর্ণ সেবায় গুরুজনগণ এবং তাঁহার দয়া, মায়া ও বিনয়পূর্ণ ব্যবহারে পরিজনবর্গ পরিতুষ্ট ছিলেন। প্রতিবেশীদের সহিত প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ থাকিবার জন্য তিনি সতত যত্নবতী ছিলেন। তিনি মূর্ত্তিমতী করুণারূপে সকলের সেবায় আত্মশক্তি নিয়োজিত করিলেন। প্রতিবেশীরা তাঁহাকে অন্নপূর্ণা জ্ঞানে ভক্তি করিত।

দরিদ্র ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অদৃষ্টগুণে এই স্ত্রীরত্নকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছিলেন। এই নারী তাঁহার গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন বলিয়া ঠাকুরদাসের সংসারে দারিদ্র্য-জনিত অশান্তি কদাচ দৃষ্ট হইত না।

ভগবতী দেবী মিতব্যয়ে নিপুণা ছিলেন বলিয়া শাশুড়ী তাঁহাকে সংসারের সমস্ত কর্ম্মের ভার সাগ্রহে অর্পণ করেন। এই সহৃদয়া পুণ্যবতী নারীর গৃহিণীনৈপুণ্য ঠাকুরদাসের ক্ষুদ্র গৃহখানিকে পুণ্যশ্রী দান করিয়াছিল। "বীরসিংহের বীরশিশু" বিদ্যাসাগর এই পুণ্যনিকেতনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভীষণ দরিদ্রতার মধ্যেও এই পরিবারে অতিথিসেবা ধর্ম্মজ্ঞানে নিষ্ঠাসহকারে প্রতিপালিত হইত। একদা প্রায় দিবাবসানকালে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া এই পরিবারে আতিথ্য গ্রহণের জন্য উপস্থিত হইলেন। সেই দিন এই পরিবারে রাত্রিকালে শিশুদের অর্দ্ধাহারের ব্যবস্থা হইবে এইরূপ স্থির ছিল। এই অবস্থায় শ্বশ্রূ দুর্গাদেবী অশ্রুপূর্ণলোচনে অভ্যাগতের নিকট অসমর্থতার কথা জানাইতেছিলেন। এমন সময়ে করুণাময়ী ভগবতী দেবী অন্তরাল হইতে মৃদুস্বরে জানাইলেন,—"মা, ক্ষুধাতুর ও তৃষ্ণার্ত্ত অতিথিকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। যেমন করিয়া হউক ইহার ব্যবস্থা হইবে। আপনি ইঁহাকে বসিবার আসন ও পা ধুইবার জল প্রদান করুন।" তখন ভগবতী দেবী তাঁহার হাতের একগাছি পিত্তলের 'পৈছা' বন্ধক রাখিয়া আতিথ্যধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন।

যে করুণারসের বিকাশে ঈশ্বরচন্দ্র দয়ার সাগর বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন, মাতৃস্তন্যের সহিত তিনি প্রচুর পরিমাণে সেই রস পান করিয়া থাকিবেন। একদা শিশু ঈশ্বরচন্দ্র খেলার

সাথীকে আপনার পরিধানের উত্তম বস্ত্রখানি দিয়া তাহার পরিধানের ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া বাড়ী আসিয়াছিলেন। মাতা প্রশ্ন করিয়া যখন জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার পুত্র দরিদ্র খেলার সাথীকে মনের আনন্দে আপন পরিধেয় বস্ত্র দান করিয়াছে তখন তিনি আনন্দিতা হইয়া বলিয়াছিলেন—"তুমি অতি উত্তম কার্য্য করিয়াছ, চরকার সূতা কাটিয়া আমি তোমাকে আর একখানা ভাল কাপড় তৈয়ার করিয়া দিব।" যেমন মা, তাঁর ছেলেও তেমনি। ভগবতী দেবী বলিতেন—"আপনি ভাল কাপড় পরার চেয়ে পরকে পরাইতে পারিলে অধিক সুখ হয়। নিজে ভাল খাওয়া অপেক্ষা পরকে উহা খাওয়াইতে পারিলে বেশী সুখ হয়।"

ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যকালে একগুঁয়ে ও অতি দুরন্ত শিশু ছিলেন; কিন্তু সন্তানবৎসলা জননীর স্নেহপাশে এই শিশু বাঁধা ছিল। সন্তানশাসনের যথার্থ বিধি ভগবতী দেবী যেমন জ্ঞাত ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠা বিদুষী নারীরা তেমন জানেন কিনা সন্দেহ। ভগবতী দেবী বলিতেন, "সন্তান শিশুসুলভ চপলতার বশবর্ত্তী হইয়া যখন কোন অন্যায় কাজ করে, তাহাকে শাসন করিবার জন্য মাতা তখন কিছু সময় তাহার সহিত আলাপ বন্ধ করিবেন, তখন সন্তান মাতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য নিঃসন্দেহে তাঁহার পেছনে পেছনে ছুটিয়া বেড়াইবে। তাহা যদি না হয় ত মাতাই বা কিরূপ, আর তাঁহার স্নেহমমতাই বা কিরূপ ?"

বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার জননী ভগবতী দেবীকে একবার তাঁহার পিতা ঠাকুরদাসের নিকট কাশীধামে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি স্বামীকে বলিয়াছিলেন—"এখানে বাস করা অপেক্ষা আমি দেশে বাস করা শ্রেয়ঃ মনে করি, সেখানে আমি অনেক অসহায় দরিদ্র লোককে ভোজন করাইতে পারিব। দেশে বাস করিয়া প্রতিবেশীদের অনাথ শিশুদিগের সাহায্য করিতে পারিলে আমার মনে সুখ হইবে। বীরসিংহই আমার কাশী, সেইখানেই আমার বিশ্বেশ্বর আছেন।"

একবার বিদ্যাসাগর জননীকে প্রশ্ন করেন—"বৎসরের মধ্যে একদিন পূজা করিয়া ছয় সাত শত টাকা ব্যয় করা ভাল, কি গ্রামের নিরুপায় অনাথ লোকদিগকে ঐ টাকা দ্বারা অবস্থানুসারে মাসে মাসে কিছু সাহায্য করা ভাল ?" জননী উত্তর করিলেন—"গ্রামের দরিদ্রেরা যদি খাইতে পায় তাহা হইলে পূজা করিবার আবশ্যক নাই।" প্রথার অনুসরণে যাহাদের মন নির্জীব হইয়া পড়ে তাহারা কখনও এমন কথা বলিতে পারেন না। ভগবতী দেবী যদি পল্লীর অপর সকল স্ত্রীলোকের মত হইতেন তাহা হইলে তিনি পুত্রকে গতানুগতিক হইয়া অপর দশ জনের মত কার্য্য করিবার উপদেশ প্রদান করিতেন। পূজা বন্ধ করিয়া সেই অর্থদ্বারা নিরন্ন গ্রামবাসীর অন্নলাভের ব্যবস্থা করিবার উপদেশ প্রদান করা যে-সে নারীর কার্য্য নহে। রবীন্দ্রনাথ

লিখিয়াছেন—"ভগবতী দেবীর হৃদয় সূর্য্যের ন্যায় আপনার উজ্জ্বল দয়ারশ্মি স্বভাবতঃই চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিয়া দিত, শাস্ত্র বা প্রথা-সংঘর্ষের অপেক্ষা করিত না। সাধারণ লোকের দয়া দিয়াশলাইশলাকার মত কেবল বিশেষরূপ সংঘর্ষেই জ্বলিয়া উঠে এবং তাহা অভ্যাস ও লোকাচারের ক্ষুদ্র বাক্সের মধ্যেই বন্ধ।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তৎপ্রণীত 'বিদ্যাসাগর-চরিত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"১২৬৬ সাল হইতে ৭১ সাল পর্য্যন্ত ক্রমিক বিস্তর বিধবাকামিনীর বিবাহ কার্য্য সমাধা হয়। ঐ সকল বিবাহিত লোককে বিপদ্ হইতে রক্ষার জন্য অগ্রজ মহাশয় বিশেষরূপে যত্নবান্ ছিলেন। উহাদিগকে মধ্যে মধ্যে দেশস্থ ভবনে আনাইতেন। ঐ সকল বিবাহিতা স্ত্রীলোককে পাছে কেহ ঘৃণা করে, একারণ জননী দেবী ঐ সকল বিবাহিতা ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীলোকের সহিত একত্র একপাত্রে ভোজন করিতেন।" জননী ভগবতী দেবীর এই কার্য্য বস্তুতঃই বিস্ময়কর। আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরে যাঁহার জন্ম, যিনি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘরে বিবাহিতা, এমন এক পল্লীবাসিনী নারী দেশাচার ও লোকাচার উপেক্ষা করিয়া বালবিধবার বিবাহে সম্মতি দিয়াছিলেন এবং স্বয়ং বিবাহিতা বালিকাদিগের সহিত এক সঙ্গে আহার করিয়া কার্য্যতঃ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন—এই ব্যাপারের গুরুত্ব এক্ষণে শতাধিক বৎসর পরে আমরা সম্যক্ ধারণা

করিতে পারিব না। বিশেষতঃ এখনও দেশাচার ও লোকাচার আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধি ম্লান করিয়া রাখিয়াছে।

এই মহিমময়ী নারীর হৃদয় স্বভাবতঃই উদার ছিল। পরমেশ্বর তাঁহাকে যে নির্ম্মল বুদ্ধি দিয়াছিলেন তিনি উহা-দ্বারাই কর্ত্তব্য অবধারণ করিতেন। পুঁথিপড়া বিদ্যা তাঁহার ছিল না, সুতরাং শাস্ত্রের শ্লোকের সহিত মিলাইয়া তিনি কিছু করিতেন না।

'বিদ্যাসাগর-চরিত' গ্রন্থে পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন জননীর উদারতা বিবৃত করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ অব্দে হ্যারিসন্ সাহেব মেদিনীপুরে ইনকাম্ ট্যাক্সের তদন্তের জন্য কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবী তাঁহাকে বীরসিংহের বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। শম্ভু-চন্দ্র লিখিয়াছিলেন—"জননী দেবী সাহেবের ভোজন সময়ে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইয়াছিলেন। তাহাতে সাহেব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। বৃদ্ধা হিন্দু স্ত্রীলোক চেয়ারে উপবিষ্টা হইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সাহেব হিন্দুর মত জননীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতৃভাবে অভি-বাদন করিয়াছিলেন। তারপর নানা বিষয়ের কথা বার্ত্তা হইল।" ভগবতী দেবী সাহেবকে বলিয়াছিলেন—"দেখ বাবা, তুমি অতি দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার লইয়া এই জিলায় আসিয়াছ; দেখিও, যেন গরীব দুঃখীর অনিষ্ট না হয়। তুমি এরূপভাবে কার্য্য করিও যে, যখন এই জিলা ত্যাগ করিয়া চলিয়া

যাইবে তখন লোকে যেন তোমার জন্য 'হায়,' 'হায়' করে।" হ্যারিসন্ সাহেব ভগবতী দেবীর অমৃতময়ী বাণী শুনিয়া মোহিত হইয়া বিদ্যাসাগরকে বলিয়াছিলেন—"এমন মা না হইলে আপনি এইরূপ হইতে পারিতেন না। মাতার গুণেই আপনি এমন উন্নত মন লাভ করিয়াছেন।"

শম্ভুচন্দ্র লিখিয়াছেন ;—"জননী দেবী প্রবীণা হিন্দু স্ত্রীলোক, তথাপি তাঁহার স্বভাব অতি উদার, মন অতিশয় উন্নত ছিল এবং তাঁহার মনে কিছুমাত্র কুসংস্কার ছিল না। কি ধনশালী, কি দরিদ্র, কি বিদ্বান্, কি মূর্খ, কি উচ্চজাতীয়, কি নীচ জাতীয়, কি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, কি অন্য ধর্ম্মাবলম্বী সকলেরই প্রতি তাঁহার সমদৃষ্টি ছিল।"

দয়াদাক্ষিণ্য, ত্যাগস্বীকার, আতিথেয়তা, উদারতা, গৃহিণী-পণা, শিষ্টাচার প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশে ভগবতী দেবীর চরিত্র অতি উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্র যে মহত্ত্বের আলোকপাতে সমুজ্জ্বল সেই আলোক তিনি এই পুণ্যবতী দেবীর চরিত্র হইতে লাভ করিয়া-ছিলেন।

পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

২১ পৃঃ
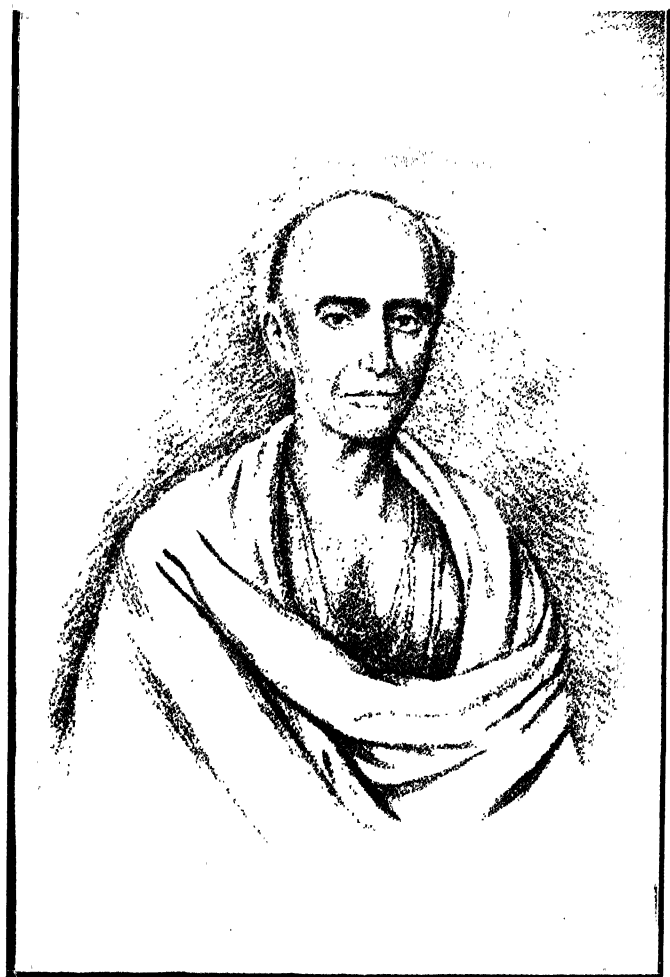
দ্বিতীয় অধ্যায়

বিদ্যার্থী ঈশ্বরচন্দ্র

মেধাবী ঈশ্বরচন্দ্র পাঁচ বৎসর বয়সে পাঠশালায় পড়িতে আরম্ভ করেন। তিনবৎসরে তাঁহার পাঠশালার পাঠ শেষ হয়। তাঁহার হস্তাক্ষর বড়ই সুন্দর ছিল। লেখাপড়ায় ঈশ্বরচন্দ্রের অসামান্য মনোযোগ ছিল। কিন্তু অন্য সকল বিষয়ে তাঁহার মত দুরন্ত ছেলে অতি অল্পই ছিল। তাঁহার দুরন্তপনার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"বিদ্যাসাগর তাঁহার বর্ণপরিচয় প্রথমভাগে গোপাল নামক একটি সুবোধ ছেলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাকে বাপমায়ে যাহা বলে সে তাহাই করে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নিজে যখন গোপালের বয়সী ছিলেন, তখন কোনো কোনো অংশে গোপাল অপেক্ষা রাখালের সঙ্গেই তাঁহার সাদৃশ্য দেখা যাইত।" আত্মজীবনীতে ঈশ্বরচন্দ্র বলিয়াছেন—"ছেলেবেলায় আমি বড় দুষ্ট ছিলাম, পাড়ার লোকের বাগানের ফল পাড়িয়া চুপি চুপি খাইতাম। কেহ কাপড় শুকাইতে দিয়াছে দেখিলে উহার উপর মলমূত্র ত্যাগ করিয়া আসিতাম, লোকে আমার জ্বালায় অস্থির হইত।" যবের ক্ষেতের নিকট দিয়া যাইবার সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র অপক্ক যবের শীষ খাইতেন। একদিন যবের শীষ গলায় ফুটিয়া যাওয়ায় তিনি

মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহী দেবী গলায় আঙ্গুল দিয়া বহু কষ্টে উহা বাহির করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পাঠশালায় পড়িতেন। এই স্নেহশীল শিক্ষকমহাশয় সেকালের গুরু মহাশয়দের আদর্শ স্থানীয় ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স যখন আট তখন এই শিক্ষক মহাশয় তাঁহার পিতাকে কহিলেন —"পাঠশালায় যাহা শিক্ষা করা যাইতে পারে ঈশ্বর তাহা সমস্তই শিখিয়াছে। এখন তাহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া ইংরাজী শিখাইতে পারিলে ভাল হয়। এই বালক মেধাবী, ইহার স্মৃতিশক্তি অতি প্রবল, এই বালক যাহা শিখিবে তাহাতেই পারদর্শী হইতে পারিবে।"

আটবৎসর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার পিতা ঠাকুরদাস ও শিক্ষক কালীকান্তের সহিত বীরসিংহ হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। এই দিন পথে একস্থানে বাট্না বাটা শিলের মত একখানি পাথর দেখিয়া বালক ঈশ্বরচন্দ্র পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এটা কি?" পিতা বুঝাইয়া দিলেন, "এটি মাইল ষ্টোন, এক মাইল অর্থাৎ আধ ক্রোশ অন্তর এইরূপ পাথর পোঁতা থাকে, এই পাথরের উপর এই এক আর নয় খোদা আছে, ইহাতে বুঝা যায় যে কলিকাতা হইতে এই স্থান উনিশ মাইল দূর।" তারপর তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালক মাইলষ্টোনগুলি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। যেখানে "১০" খোদা ছিল সেইখানে আসিয়া তিনি পিতাকে কহিলেন,

—"বাবা, আমি ইংরাজী সংখ্যা শিখিয়াছি।" পিতা পুত্রকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র মাইলষ্টোনে খোদিত নয়, আট ও সাত এই সংখ্যা তিনটি ঠিক বলিতে পারিলেন। যখন তাঁহারা ছয় সংখ্যার কাছে আসিয়াছিলেন তখন কৌশল করিয়া ঈশ্বরকে অন্যমনস্ক করা হইয়াছিল। পাঁচ সংখ্যায় আসিয়া ঠাকুরদাস ঈশ্বরকে প্রশ্ন করিলেন। ঈশ্বর বলিলেন —"এটা হওয়া উচিত ছিল ছয়ের অঙ্ক কিন্তু ভুলে পাঁচ লেখা হইয়াছে।" ঠাকুরদাস সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"তোমার ইংরাজী সংখ্যা শিখা হইয়াছে ইহা সত্য, আমি ছয়ের অঙ্ক গোপন করিয়াছিলাম।"

যেদিন সন্ধ্যাবেলা ঈশ্বরচন্দ্র পিতার সহিত কলিকাতায় আসিলেন, তার পরদিন সকালবেলা ঠাকুরদাস জগদ্দুর্লভ বাবুদের কতগুলি ইংরাজী বিল ঠিক দিতেছিলেন। বালক ঈশ্বরচন্দ্র বলিলেন—"বাবা, আমি এইগুলি ঠিক দিতে পারি।" সত্য সত্যই বালক কয়েকখানি বিল নির্ভুলভাবে ঠিক দিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। উপস্থিত সকলে ঈশ্বরচন্দ্রকে একটি ভাল ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিবার অনুরোধ করিলেন। ঠাকুরদাস তাঁহাকে হিন্দুকলেজে পড়াইবার অভিলাষী হইলেন। কিন্তু প্রথম তিনমাস এক পাঠশালায় পড়াইতে হইয়াছিল।

রাইমণি

স্নেহময়ী মাতা ও পিতামহীকে ছাড়িয়া কলিকাতায়

আসিয়া বালক ঈশ্বরচন্দ্র বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার পিতা বেলা একপ্রহরের সময়ে কাজে বাহির হইতেন, রাত্রি একপ্রহরের পরে ফিরিতেন। এই দীর্ঘ সময় তিনি জগদ্দুর্লভ বাবুর বাড়ীর পরিবারস্থ লোকদের তত্ত্বাবধানে থাকিতেন। জগদ্দুর্লভ বাবুর কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণি ঈশ্বরচন্দ্রকে পুত্রবৎ ভালবাসিতেন। এই করুণাময়ী নারী বাৎসল্যরস সেচন করিয়া বালকের স্নেহের ক্ষুধা মিটাইতেন। আত্মজীবনীতে ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়াছেন—"স্নেহ, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণে রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্য্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্ত্তি আমার হৃদয়মন্দিরে দেবী মূর্ত্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার কথা উপস্থিত হইলে তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্ত্তন করিতে করিতে অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমার মনে হয় সে নির্দ্দেশ অসঙ্গত নহে। যে-ব্যক্তি রাইমণির সেই দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফল ভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয় তাহা হইলে তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।"

কলিকাতায় আসিয়া ঈশ্বরচন্দ্র অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ এই তিন মাস পাঠশালায় পড়িয়া ফাল্গুন মাসে উদরাময় রোগে অসুস্থ হইয়া পড়েন। সেখানে কোন চিকিৎসায় উপকার

হইল না। বীরসিংহ গ্রামে গিয়া বিনা চিকিৎসায়ই সপ্তাহমধ্যে তিনি সুস্থ হইয়াছিলেন। জ্যৈষ্ঠমাসে ঠাকুরদাস পুনরায় তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন।

সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ

এবার শিক্ষার নূতন ব্যবস্থা হইল। ঠাকুরদাসের পিতৃপিতামহ সকলেই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন। দরিদ্রতার জন্য তিনি সংস্কৃত শিখিয়া পণ্ডিত হইতে পারেন নাই। পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে তিনি উত্তমরূপে সংস্কৃত শিখাইবার অভিলাষী হইলেন। তখন তাঁহার আত্মীয় মধুসূদন বাচস্পতি সংস্কৃত কলেজে পড়িতেছিলেন। তাঁহার পরামর্শে ঠাকুরদাস পুত্রকে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স নয় বৎসর। তিনি ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন। কুমারহট্ট-নিবাসী পণ্ডিত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহার অধ্যাপক ছিলেন। বিদ্যাশিক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্রের অসামান্য আগ্রহ দেখিয়া অধ্যাপক মহাশয় তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কলেজ-প্রবেশের ছয় মাস পরে এক পরীক্ষায় মেধাবী বালক পাঁচ টাকা বৃত্তি পাইলেন। এই সময়ে স্নেহশীল পিতা ঠাকুরদাস প্রত্যহ বেলা নয়টার সময়ে পুত্রকে বড় বাজারের বাসা হইতে পটল ডাঙ্গার কলেজে পৌঁছাইয়া দিতেন, আবার চারিটায় আসিয়া বাসায় লইয়া যাইতেন। মাসছয় পরে পিতা যখন বুঝিলেন যে,

তাঁহার শিশুপুত্র একাকী কলেজে যাইতে পারিবে এবং কুসঙ্গে মিশিবে না তখন আর তিনি তাঁহার সহিত যাইতেন না।

বালক ঈশ্বরচন্দ্র 'বাঁটুল' ছিলেন। আবার শরীরের তুলনায় মাথাটি ছিল অনেক বড়। এই বেঁটে বালকটি যখন বড় একটা ছাতা মাথায় দিয়া কলেজে আসিতেন, তখন দূর হইতে লোকে ছাতাই দেখিতে পাইত, বালকটি আর নজরে পড়িত না। এই সময়ে কলেজের ছাত্রেরা তাঁহাকে "যশুরে কৈ" আবার কখন কখন উল্টাইয়া "কসুরে যৈ" বলিয়া ক্ষেপাইত। ঈশ্বরচন্দ্র খুব ক্ষেপিয়া যাইতেন, রাগে তাঁহার মুখ লাল হইত, শৈশবে তোৎলা ছিলেন বলিয়া রাগের সময়ে মুখদিয়া তাঁহার কথা বাহির হইত না। তিনি যত রাগিতেন, বালকগণ মজা পাইয়া তাঁহাকে তত বেশী ক্ষেপাইত।

পিতা ঠাকুরদাস কঠোর শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র যে-দিন যাহা পড়িতেন গৃহে ফিরিয়া তাহা অবিকল পিতাকে শুনাইতেন, একটি কথা এদিক ওদিক হইলে শাস্তি পাইতে হইত। পিতার প্রহারের ভয়ে রাত্রি জাগিয়া পড়িবার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র চক্ষে প্রদীপের তৈল দিয়া ক্লেশ পাইতেন। শেষরাত্রে ঘুম ভাঙ্গাইয়া পিতা তাঁহাকে উদ্ভট শ্লোক শিখাইতেন। এইরূপে তিনি পিতার নিকট দুই তিন শত শ্লোক শিখিয়াছিলেন। তিনি তিন বৎসরকাল ব্যাকরণ পাঠ করেন। দুইবৎসর পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন।

এক বৎসর আশানুরূপ ফল লাভ করিতে না পারিয়া ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিলেন। অভিমানে সংস্কৃত কলেজ ছাড়িয়া তিনি গ্রামে যাইয়া সার্ব্বভৌমের টোলে পড়িবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা ও অধ্যাপকগণ বিরোধী হওয়ায় তাহা করিতে পারেন নাই। ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র হইবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। শ্রমশীলতা, আত্মনির্ভর, অধ্যবসায় প্রভৃতি যে-সকল সদ্‌গুণের বিকাশে তাঁহার চরিত্র ভবিষ্যতে অলোকসামান্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছিল, এই বাল্যেই তিনি সেই সকল গুণের পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

দারিদ্র্যক্লেশ

দরিদ্র পিতার দরিদ্র পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যেই দরিদ্রতাকে আপনার সখা বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। দরিদ্রতার আগুনে পুড়িয়াই তিনি শুদ্ধ ও পবিত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা মাসিক দশটি টাকা বেতন পাইতেন। উহা দিয়া তিনি বাড়ীর ও কলিকাতায় বাসার ব্যয় চালাইতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর দীনবন্ধুও কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। বাসায় চারিজনের রান্না হইত। ঈশ্বরচন্দ্র স্বহস্তে রান্না করিতেন, বাজারে যাইতেন, বাট্‌না বাটিতেন, উনুন ধরাইবার জন্য কাঠ 'চালা' করিতেন, আহারান্তে উচ্ছিষ্ট মুক্ত করিয়া বাসন ধুইতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বালক

ঈশ্বরচন্দ্র এই সকল কাজ আনন্দের সহিত করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র যে দারিদ্র্যক্লেশ সহিয়াছেন তাহা অত্যন্ত কঠোর। তিনি এই দারিদ্র্য-পীড়ন বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—"কখন অন্ন জুটিত, কখন জুটিতনা। যখন জুটিত তখনও সকল সময়ে পেট ভরিয়া খাইতে পাইতাম না। যখন ভাত জুটিত, তখন হয়ত ব্যঞ্জন থাকিত না, নুনভাতে দিন কাটাইতে হইত। যখন মাছ ও তরকারী পাইতাম, তখন ঝোল রাঁধিয়া এক বেলার ভাত ঝোল দিয়া খাইতাম, বিকালের ভাত তরকারী দিয়া খাইয়া মাছ পরদিনের জন্য রাখিতাম। সেই মাছে পর দিন অম্বল রাঁধিয়া উহা দিয়া ভাত খাইতাম।" যিনি প্রত্যেক দিন এইরূপ দরিদ্রতার সহিত যুদ্ধ করিতেন সেই বালকই তখন নিজের বৃত্তির টাকার কিছু কিছু দরিদ্র সমপাঠীদিগকে দান করিতেন। এমন দয়ার দৃষ্টান্ত তুর্লভ। দরিদ্রতার সহিত সংগ্রামে বালক ঈশ্বরচন্দ্রের আত্মসংযম, অধ্যবসায় ও চরিত্রের বল বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

কাব্য, অলঙ্কার, ন্যায়, স্মৃতি

বার বৎসর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র কাব্য পড়িতে আরম্ভ করেন। তখন সুপণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। সমপাঠীদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা অল্পবয়স্ক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মত ধী-শক্তি আর কাহারও ছিল না। তর্কালঙ্কার মহাশয় বালক ঈশ্বরচন্দ্রের বিশিষ্টতা

বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে কাব্যের শ্রেণীতে গ্রহণ করিতে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। বালক বলিলেন—"আমাকে পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করা হউক।" তখন তাঁহাকে ভট্টিকাব্যের কয়েকটি কঠিন শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে বলা হইল। তিনি সেই শ্লোকগুলির যেরূপ অন্বয় ও অর্থ করিলেন, বয়স্ক বালকেরাও তেমন পারিলেন না। ইহাতে তর্কালঙ্কার মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি চিরদিন তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। কাব্যের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ঈশ্বরচন্দ্র রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও রাঘব-পাণ্ডবীয় প্রভৃতি কাব্যের পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার পাইয়াছিলেন। দ্বিতীয় বর্ষে মাঘ, ভারবি, মেঘদূত, শকুন্তলা, উত্তরচরিত, বিক্রমোর্ব্বশী, মুদ্রারাক্ষস, কাদম্বরী ও দশকুমার-চরিত প্রভৃতি কাব্য আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করিয়া পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁহার রচনা ও অনুবাদে বানান কিংবা ব্যাকরণের ভুল থাকিত না। তাঁহার হাতের লেখা খুব সুন্দর ছিল। যাহা পড়িতেন তাহা সমস্তই মনে রাখিতে পারিতেন বলিয়া কেহ কখনও তাঁহাকে কোন বিষয়ে পরাস্ত করিতে পারিত না। তাঁহার অধ্যাপকেরা বিস্মিত হইয়া বলিতেন—"ঈশ্বর শ্রুতিধর, এই বালক দীর্ঘজীবী হইলে অদ্বিতীয় ব্যক্তি হইবে।" পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ঈশ্বরচন্দ্রের সমপাঠী ছিলেন।

এই সময়েই পণ্ডিত বলিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের সুনাম হইয়াছিল। বীরসিংহ ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া উপলক্ষে তিনি যে-শ্লোক রচনা করিয়া দিতেন উহার পদ-লালিত্য ও রচনার নৈপুণ্য সকলেই প্রশংসা করিতেন। তখনই তিনি অনর্গল সংস্কৃতে কথা বলিতে ও বিচার করিতে পারিতেন। এই সময়ে চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি পিতার আদেশে বীরসিংহের নিকটবর্ত্তী ক্ষীরপাই গ্রামনিবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অষ্টমবর্ষীয়া সুলক্ষণা ও সুন্দরী কন্যা দীনময়ীকে বিবাহ করেন।

পনর বৎসর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র অলঙ্কার শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন। প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহার অধ্যাপক ছিলেন। তিনি এক বৎসরমধ্যে সাহিত্য-দর্পণ, কাব্যপ্রকাশ ও রসগঙ্গাধর প্রভৃতি অলঙ্কার গ্রন্থ পাঠ করিয়া বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তখন একদিন বালক ঈশ্বরচন্দ্র তারকনাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সমীপে সাহিত্যদর্পণ আবৃত্তি করিতেছিলেন; কার্য্যোপলক্ষে সেই স্থানে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় উপস্থিত হন। তর্কপঞ্চানন মহাশয় বলিলেন—"এমন অল্প বয়সের বালক সাহিত্যদর্পণের কি বুঝিবে?" তর্কবাচস্পতি মহাশয় বলিলেন—"বালক কিরূপ শিখিয়াছে তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন না।" তখন বালকের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তর্কপঞ্চানন মহাশয় দেখিলেন,

আকারে ক্ষুদ্র হইলেও বালক জ্ঞানে প্রবীণ। তিনি বিস্মিত হইয়া তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে বলিলেন—"এ বালক কালে সমগ্র বাঙ্গলা দেশে অদ্বিতীয় লোক হইবে। এত অল্প বয়সে সংস্কৃত ভাষায় এমন ব্যুৎপন্ন লোক আমি আর দেখি নাই।"

তখন সংস্কৃত কলেজে শিক্ষার্থীরা অলঙ্কার শাস্ত্রের পরে ন্যায় ও বেদান্ত পড়িতেন। পরে দুই তিন বৎসর স্মৃতি শাস্ত্র পড়িয়া উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তাঁহারা জজ পণ্ডিতের পদ পাইতেন। বালক ঈশ্বরচন্দ্র অলঙ্কার শ্রেণীতে পড়িবার সময়েই স্মৃতিশাস্ত্র পড়িবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। ছয় মাস মধ্যে সমগ্র স্মৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি তাঁহার অধ্যাপকদিগকে বিস্ময়াবিষ্ট করিলেন। তখন জজ পণ্ডিতের পদ পাইবার জন্য "ল" কমিটির পরীক্ষা দিতে হইত। ঈশ্বরচন্দ্র যখন ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন তখন তিনি কিশোর বয়স্ক, বয়স সতর, মুখে গোঁপের রেখাও উঠে নাই। এই সময়ে তিনি আবেদন করিয়া কুমিল্লায় জজ পণ্ডিতের পদ পাইয়াছিলেন। কিন্তু পিতা ঠাকুরদাসের অনুমতি না পাওয়ায় তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

উনিশ বৎসর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র বেদান্ত পড়িতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার বুদ্ধিমত্তায় অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয় মোহিত হইলেন। অধ্যাপনাকালে যে সকল বিষয়ে তাঁহার

মনে সন্দেহ জন্মিত তিনি বালক ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত সেই সকল বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতেন। সময় সময় ইহাতে অধ্যাপক মহাশয়ের সন্দেহ ভঞ্জন হইত। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বালককে বলিতেন—"তুমি ঈশ্বর"। তখন স্মৃতি, ন্যায় ও বেদান্ত শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার সময়ে সংস্কৃত গদ্য ও পদ্য রচনার পরীক্ষা গ্রহণ করা হইত। যাঁহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইত তিনি একশত টাকা পুরস্কার পাইতেন। এই পরীক্ষা দিবার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া আনিয়া পরীক্ষাস্থানে বসাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত গদ্যপ্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায় তিনি একশত টাকা পুরস্কার পাইলেন। তাঁহার পদ্য রচনার জন্যও তিনি পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। ইহার পরে তিনি ন্যায় ও দর্শন অধ্যয়ন করেন। এই বৎসরও তিনি উৎকৃষ্ট গদ্য ও পদ্য রচনা লিখিয়া দুই শত টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন। এই টাকা তিনি ঋণ শোধের জন্য পিতা ঠাকুরদাসকে দিয়াছিলেন।

বাসগৃহ

ছাত্র জীবনে ঈশ্বরচন্দ্র কিরূপ দরিদ্রতার ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তিনি কিরূপ ঘরে রন্ধন ও আহার করিতেন তাহা শুনিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

তখন কলিকাতা সহরে অধিকাংশ বাড়ীতেই ময়লা দুর্গন্ধ-পূর্ণ জলে ভরা পুকুর ও ডোবা ছিল। রাস্তার দুইধারের জল-প্রণালীতে মল ভাসিত, কৃমিকীট সর্ব্বদা কিল্ বিল্ করিত। বালক ঈশ্বরচন্দ্র যে কুঁড়ে ঘরখানিতে বসিয়া দুই বেলা রান্না ও আহার করিতেন সেই ঘরের পাশেও ঐরূপ জল-প্রণালী ছিল। তিনি যখন আহারে বসিতেন তখন কীট-গুলি তাঁহার থালার নিকটে আসিত; সেগুলিকে তাড়াইবার জন্য তিনি এক ঘটী জল কাছে রাখিতেন; আবশ্যকমত জল ঢালিয়া কীটগুলিকে তাড়াইয়া দিতেন। এমনই দুর্গন্ধ-পূর্ণ স্থানে বসিয়া জ্ঞানের সাধক বালক ঈশ্বরচন্দ্র দুই বেলা আহার করিতেন। এই রান্না ঘরখানিতে কোন সময়ে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিত না, দুপুর বেলাও বাতি জ্বালিয়া রাঁধিতে হইত। এই অন্ধকার ঘরখানিতে অসংখ্য আরসুলা বাস করিত। এইজন্য ঈশ্বরচন্দ্রকে অতি সতর্কতার সহিত রাঁধিতে হইত। একদিন খাইবার সময়ে তিনি ব্যঞ্জনমধ্যে একটি আর-সুলা দেখিতে পাইলেন। পাছে অন্য সকলের আহারে ব্যাঘাত হয় এই ভয়ে তিনি ব্যঞ্জনের সহিত আরসুলাটি নীরবে গিলিয়া ফেলিলেন। এই ছোট ঘটনাটি তাঁহার অসামান্য আত্মসংযম ও উপস্থিত-বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।

চরিত্রের বল

ঈশ্বরচন্দ্র রূপবান্ ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে

অসামান্য তেজ ও মুখে প্রতিভার দীপ্তি ছিল বলিয়া তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের তখনকার ছাত্র ও অধ্যাপকগণ সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন। অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয় তাঁহাকে পুত্রের মত স্নেহ করিতেন। এই স্থবির অধ্যাপক মহাশয়ের কেহ ছিলেন না, বালক ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহাকে সময় সময় সেবা করিতেন। শম্ভুচন্দ্র ছাতু বাবু ও লাটু বাবুদের সভা পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা উৎসাহী হইয়া এই স্থবির অধ্যাপকের সহিত এক বালিকার বিবাহ স্থির করেন। তখন শম্ভুচন্দ্র তাঁহার পুত্রাধিক সুযোগ্য ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কাজ করিতেন না। তিনি এই বিষয়ে তাঁহার অভিমত জানিতে চাহিলেন। তেজস্বী ঈশ্বরচন্দ্র দৃঢ় কণ্ঠে কহিলেন—"এই বৃদ্ধবয়সে আপনার বিবাহ করা কিছুতেই উচিত নহে। আপনি আর বেশী দিন বাঁচিবেন না। বিবাহ করিলে নিরপরাধা এক বালিকাকে চিরদুঃখিনী করিবেন। বিবাহ দূরে থাকুক, বিবাহের চিন্তা করাও এখন আপনার পক্ষে পাপ হইবে।" শম্ভুচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"লাটু বাবুর চেয়েও উনি বেশী বুঝেন।" ঈশ্বরচন্দ্র নীরবে কিছু দূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার অনুমতি পাইবার জন্য অগ্রসর হইয়া হাত ধরিয়া মিনতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র কিছুতেই টলিলেন না। তিনি দৃঢ়তার সহিত আবার তাঁহার অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। যথা সময়ে বিবাহ হইয়া

গেল। এই ঘটনায় ঈশ্বরচন্দ্র বড়ই মনোবেদনা পাইলেন। কিন্তু অধ্যাপক মহাশয়ের সহিত তাঁহার প্রীতির সম্বন্ধ পূর্ব্বের মতই ছিল।

একদিন বাচস্পতি মহাশয় বলিলেন, "ঈশ্বর, তোমার মাকে একদিন দেখিতে গেলে না?" এই কথা শুনিয়া ঈশ্বরচন্দ্র অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। তিনি বলপূর্ব্বক ঈশ্বরচন্দ্রকে বাড়ীতে লইয়া গেলেন। বালিকা-বধূর পায়ের উপর দুইটি টাকা রাখিয়া প্রণাম করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিতেছিলেন। বাচস্পতি মহাশয় তাঁহাকে হাত ধরিয়া আনিয়া বলিলেন—"তোমার মাকে দেখিয়া যাও।" বালিকা-বধূকে দেখিয়া তাঁহার শোচনীয় পরিণাম চিন্তা করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। "ঈশ্বর, অকল্যাণ করিস্ নে," বলিয়া বাচস্পতি মহাশয় চীৎকার করিয়া উঠিলেন। "এ ভিটায় আর কখনও জলস্পর্শ করিব না" বলিয়া তিনি চলিয়া আসিলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে বালিকা-পত্নীকে অকূল দুঃখসাগরে ভাসাইয়া বাচস্পতি মহাশয় পরলোক গমন করেন। অধ্যাপক মহাশয়ের বালিকা পত্নীর অকাল বৈধব্য মহাপ্রাণ ঈশ্বরচন্দ্রের তরুণ হৃদয়ের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল উহাই ভবিষ্যতে তাঁহাকে বালবিধবাদের বিবাহ-প্রচলনের আন্দোলনে নিযুক্ত করিয়া থাকিবে। বিধবা-বিবাহ-প্রচলনের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াই ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার 'দয়ার সাগর' নাম সার্থক করিয়াছিলেন।

ছাত্রজীবনে অধ্যাপকতা ও 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ

ন্যায় ও দর্শনের শ্রেণীতে পড়িবার সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র দুইমাসের জন্য ব্যাকরণের অধ্যাপকতা করিয়া আশী টাকা বেতন পাইয়াছিলেন। তিনি ঐ টাকা তীর্থভ্রমণের জন্য পিতা ঠাকুরদাসকে দিয়াছিলেন। ইহার পর ঈশ্বরচন্দ্র দর্শনশাস্ত্রের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া একশত টাকা, সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতা-রচনার জন্য একশত টাকা, আইন পরীক্ষার পুরস্কার পঁচিশ টাকা, উত্তম হস্তাক্ষরের জন্য আট টাকা, মোট দুইশত তেত্রিশ টাকা এক কালীন পাইয়াছিলেন। এই টাকা তিনি পিতার হাতে দিয়া তাঁহাকে ঋণশোধ করিতে বলিলেন। তিনি চারি বৎসরকাল দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ষড়্দর্শনে বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করেন। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় বলিয়াছেন—"এমন মেধাবী ছাত্র আমি আর দেখি নাই। ইহাকে পড়াইবার জন্য দর্শনশাস্ত্রের প্রতি আমার বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইত; পড়াইবার সময় মনে হইত যেন ঈশ্বর কত কাল পূর্ব্বে ঐ সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন।" ঈশ্বরচন্দ্র অসামান্য প্রতিভাশালী ছিলেন বলিয়া পর্ব্বত-প্রমাণ বাধা ও বর্ণনাতীত দারিদ্র্যদুঃখ সহ্য করিয়া আপনার অনন্যসুলভ গুণপনা ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় প্রদান করিতে পারিয়াছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের যখন বিশ বৎসর বয়স তখন সংস্কৃত কলেজের

অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ মিলিত হইয়া তাঁহাকে "বিদ্যাসাগর" উপাধি দান করেন। উপাধি-পত্রে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, বেদান্ত, ন্যায়, জ্যোতিষ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপকগণ ও অধ্যক্ষ মহাশয়ের স্বাক্ষর রহিয়াছে। উপাধি পত্রখানির প্রতিলিপি এই—

অস্মাভিঃ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরায় প্রশংসাপত্রং দীয়তে। অসৌ কলিকাতায়াং শ্রীযুক্ত কোম্পানি স্থাপিত বিদ্যামন্দিরে দ্বাদশ বৎসরান্ পঞ্চ মাসাংশ্চোপস্থায়াধোলিখিত শাস্ত্রাণ্য-ধীতবান্।

ব্যাকরণম্—শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মভিঃ
কাব্যশাস্ত্রম্—শ্রীজয়গোপাল শর্ম্মভিঃ
অলঙ্কারশাস্ত্রম্—শ্রীপ্রেমচন্দ্র শর্ম্মভিঃ
বেদান্তশাস্ত্রম্—শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মভিঃ
ন্যায়শাস্ত্রম্—শ্রীজয়নারায়ণ শর্ম্মভিঃ
জ্যোতিঃশাস্ত্রম্—শ্রীযোগধ্যান শর্ম্মভিঃ
ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ—শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মভিঃ

সুশীলতয়োপস্থিতস্যৈতেষু সমীচীনা ব্যুৎপত্তিরজনিষ্ট। ১৭৬৩ এতচ্ছকাব্দীয় সৌর মার্গশীর্ষস্য বিংশতি দিবসীয়ং।

10, December, 1841. (Sd) Rasomay Datta,
Secretary.

ঈশ্বরচন্দ্র 'বিদ্যাসাগর' হইলেন। তাঁহার বিদ্যার খ্যাতি দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহার বিদ্যাগৌরবে জনকজননীর ও জননী জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল হইল।

তৃতীয় অধ্যায়

শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর

ফোর্ট্‌ উইলিয়ম্‌ কলেজে কার্য্য-গ্রহণ

ছাত্র-জীবনে ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিভাশালী আদর্শ ছাত্র ছিলেন। তেজস্বিতা, লোকসেবা, আত্মনির্ভর, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণের বিকাশে তাঁহার চরিত্র অপূর্ব্ব আকর্ষণের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সকল গুণ উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল।

পাঠ শেষ করিয়া তিনি যখন বীরসিংহের গৃহে গমন করিয়া দেবীরূপিণী জননীর সহিত বাস করিতেছিলেন তখন মধু-সূদন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মৃত্যুতে কলিকাতা ফোর্ট্‌ উইলিয়ম্‌ কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদ খালি হয়। এই কলেজের অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেব পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। সেখানে তিনি প্রতিভাশালী বালক ঈশ্বরচন্দ্রের অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়াছিলেন। এইজন্য তিনি এখন প্রধান পণ্ডিতের পদে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নিযুক্ত করিবার জন্য উৎসাহী হইলেন। মার্শেল সাহেব সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের দ্বারা পিতা ঠাকুরদাসকে এই সংবাদ জানাইলেন। ঠাকুরদাস বীরসিংহ

হইতে পুত্রকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। ১৮৪১ অব্দের শেষভাগে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে ঈশ্বরচন্দ্র ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইলেন।

তখন সিবিল সার্ব্বিসের প্রতিযোগী পরীক্ষা ছিল না। ইংলণ্ডের হালিবারি কলেজের পাঠ শেষ করিয়া সিবিলিয়ানেরা এদেশে আসিয়া ফোর্ট্ উইলিয়ম্ কলেজে দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতেন। দেশী ভাষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে তাঁহারা কাজ পাইতেন না। ঈশ্বরচন্দ্র এই সিবিলিয়ানদিগকে বাঙ্গলা ভাষা শিখাইতেন; ইঁহাদের পরীক্ষার ভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। তাঁহার অধ্যাপনায় ও কর্ম্মকুশলতায় মার্শেল সাহেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। যে-সকল সিবিলিয়ান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন না, তাঁহাদিগকে মনঃক্ষুন্ন হইয়া দেশে ফিরিয়া যাইতে হইত। এই জন্য মার্শেল সাহেব একবার পরীক্ষার কড়াকড়ি ব্যবস্থা একটু শিথিল করিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছিলেন। উত্তরে তেজস্বী ঈশ্বরচন্দ্র বলিয়াছিলেন— "আমি উহা পারিব না, বরং চাকুরী ছাড়িব, তবু অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে পারিব না।" স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান বিন্দুমাত্র খর্ব্ব করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কখনও কোন কাজ করিতে সম্মত হন নাই।

এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় ইংরাজী ও হিন্দি শিখিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরে রাজ-

নারায়ণ বসু, তারপর নীলমাধব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে ইংরাজী শিখাইতেন। অতঃপর তিনি ইংরাজীর জন্য মাসিক পনর টাকা বেতনে একজন ইংরাজী শিক্ষক এবং হিন্দীর জন্য মাসিক দশ টাকা বেতনে একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত রাখিয়াছিলেন। অল্পদিন মধ্যেই তিনি এই দুইভাষা উত্তম-রূপে শিখিয়াছিলেন।

অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব্বাগ্রে পিতার দুঃখ দূর করিতে অভিলাষী হইলেন। তাঁহার অভিপ্রায়ে ও অনুরোধে ঠাকুরদাস কর্ম্মত্যাগ করিয়া বীর-সিংহে গমন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রত্যেক মাসের আরম্ভে পিতাকে কুড়ি টাকা পাঠাইতেন। বাকী ত্রিশ টাকা দিয়া কলিকাতার বাসায় নয় জনের ব্যয় চলিত।

বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বেশী বয়সে তাঁহার সংস্কৃত শিখিবার ইচ্ছা হয়। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্নেহাস্পদ ছিলেন। সংস্কৃত শিখিবার বাসনা তিনি তাঁহাকে জানাইলেন। দুর্ব্বোধ্য মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অনেক দিন ধরিয়া পড়াইলে রাজকৃষ্ণ বাবু ধৈর্য্যচ্যুত হইতে পারেন এই জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে নিজের উদ্ভাবিত এক নূতন প্রণালীতে ব্যাকরণ শিখাইয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণ বাবু ছয় মাসমধ্যে মুগ্ধবোধের সকল জ্ঞাতব্য বিষয় শিখিয়াছিলেন। এই লিখিত তথ্য অবলম্বনে পরে তাঁহার উপাদেয় গ্রন্থ "উপক্রমণিকা"

রচিত হইয়াছিল। এই পুস্তকখানি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনস্বিতার অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন ফোর্ট্ উইলিয়ম্ কলেজে পণ্ডিতের কার্য্য করিতেন সেই সময়কার বড়লাট্ লর্ড্ হার্ডিঞ্জ্ একদিন কলেজ পরিদর্শন করিতে আইসেন। সেই দিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি তাঁহাকে জানাইলেন, "যাঁহারা সংস্কৃত কলেজ হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন সেই সকল ছাত্রের প্রতি গবর্ণমেণ্টের এখন আর দৃষ্টি নাই। এত দিন তাঁহারা জজ-পণ্ডিতের পদ পাইতেন, এখন উহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই জন্য লোকের এখন আর সংস্কৃত শিখিবার আগ্রহ নাই, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রসংখ্যাও দিন দিন কমিতেছে।" ১৮৪৬ অব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রস্তাবমত লর্ড্ হার্ডিঞ্জ্ বঙ্গদেশে এক শত একটি বাঙ্গলা বিদ্যালয় স্থাপনের আদেশ করেন। এই বিদ্যালয়গুলিতে সংস্কৃত কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রগণ শিক্ষক নিযুক্ত হইতেন। এই শিক্ষকদের পরীক্ষা গ্রহণ ও নিয়োগের ভার মার্শেল সাহেব ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর অর্পিত হইয়াছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ফোর্ট্ উইলিয়ম্ কলেজে সিবিলিয়ান সাহেবদিগকে সংস্কৃত, হিন্দী ও বাঙ্গলা পড়াইতেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় লর্ড্ হার্ডিঞ্জ্ বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গলা বিদ্যালয়ও স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন এই কলেজে ও স্কুলগুলিতে পড়াইবার উপযোগী পুস্তক অতি অল্পই ছিল।

বাঙ্গলা সাহিত্যের এই অভাব তখন তিনি বিশেষরূপে অনুভব করিতেন। পুস্তক রচনার চিন্তাও এই সময়ে তাঁহার চিত্ত অধিকার করে। 'বাসুদেব-চরিত' নামক একখানি পুস্তক এই সময়ে তিনি লিখিয়াছিলেন। এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্দ অবলম্বনে এই পুস্তক রচিত হইয়াছিল।

সেবাব্রত

বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল বিদ্যার সাগর ছিলেন না, তিনি দয়ারও সাগর ছিলেন। দরিদ্রতার পবিত্র আগুনে পুড়িয়া তিনি খাঁটী সোণা হইয়াছিলেন। দুঃখীর দুঃখ, ব্যথিতের বেদনা, বিপন্নের বিপদ্ তিনি যেমন বুঝিতেন এমন কে আর বুঝিবে? তিনি যখন দরিদ্র ছাত্র তখনও জলপানির টাকা দিয়া দরিদ্র সমপাঠীর সাহায্য করিতেন। এখন দরিদ্রের সেবা তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক কর্ত্তব্য হইল। কোন দরিদ্র ব্যক্তি অসুস্থ হইয়াছে, এইরূপ সংবাদ পাইলে তিনি নিজে তাহার কাছে যাইয়া তাহার চিকিৎসা ও সেবার ব্যবস্থা করিতেন।

বন্ধুপ্রীতি

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তুল্য বন্ধু-বৎসল ব্যক্তি সংসারে অতি অল্পই দেখা যায়। সুপ্রসিদ্ধ মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় তর্কালঙ্কার

মহাশয় ফোর্ট্ উইলিয়ম্ কলেজে পণ্ডিতের পদ লাভ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি বহু ব্যক্তি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহায়তায় কার্য্যলাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন।

নিম্নলিখিত ঘটনাটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নির্লোভতা ও বন্ধুবাৎসল্যের অতি উজ্জ্বল উদাহরণ। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন ফোর্ট্ উইলিয়ম্ কলেজে পঞ্চাশ টাকা বেতনে কাজ করিতেছিলেন তখন সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ পড়াইবার জন্য নব্বই টাকা বেতনে একজন অধ্যাপক গ্রহণের কথা হইল। কলেজে অধ্যক্ষ ময়েট্ সাহেব মার্শেল সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই পদে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা করিলেন। যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করা হইল তখন তিনি এই পদ গ্রহণে অসম্মত হইলেন। মার্শেল সাহেব অনেক চেষ্টা করিয়াও বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই পদগ্রহণে সম্মত করিতে না পারিয়া বিস্মিত হইলেন। তখন তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কাঁহাকে এই পদের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া মনে কর?" বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তর করিলেন—"তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ, তিনি এই পদে নিযুক্ত হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি।" তখন বাচস্পতি মহাশয়কে এই পদে গ্রহণ করা স্থির হইল। এই সময়ে বাচস্পতি মহাশয় কাল্‌নায় ছিলেন। উচ্চমনা ঈশ্বরচন্দ্র ত্রিশ ক্রোশ

পায় হাঁটিয়া কাল্‌নায় যাইয়া বাচস্পতি মহাশয়কে এই সংবাদ জানাইয়াছিলেন। এই দরিদ্র সুপণ্ডিত বন্ধুকে একটি কাজ সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিশ্রুত ছিলেন; এই পদে বন্ধুকে নিযুক্ত করিতে পারিয়া তিনি পরম আহ্লাদিত হইলেন।

মাতৃভক্তি

ঈশ্বরচন্দ্র মাতাপিতাকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করিতেন। তিনি বলিতেন—"ইঁহারাই আমার অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বর।" বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন ফোর্ট্ উইলিয়ম্ কলেজে কাজ করিতেন তখন তাঁহার ভ্রাতা শম্ভুর বিবাহ হইয়াছিল। মাতা লিখিয়াছিলেন—"শম্ভুর বিবাহে তুমি অবশ্য বাড়ী আসিও।" বিদ্যাসাগর মহাশয় ছুটীর জন্য অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন। অধ্যক্ষ মহাশয় জানাইলেন, "আজকাল কলেজে কাজের খুব তাড়া আছে, এই সময়ে ছুটী দেওয়া অসম্ভব।" এই কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বড়ই বিষণ্ণ হইলেন। মায়ের আদেশ রক্ষা করিতে পারিবেন না ভাবিয়া তিনি এমনই মর্ম্মযাতনা ভোগ করিতেছিলেন যে পর দিন কলেজে যাইয়া অধ্যক্ষ মহাশয়কে জানাইলেন—"সাহেব, আমাকে মায়ের আদেশ পালন করিতেই হইবে। আমাকে ছুটী দেওয়া যদি অসম্ভব হয় তো আমি কার্য্যে ইস্তফা দিয়া বাড়ী যাইব।" মাতৃভক্ত

ঈশ্বরচন্দ্রের মনের দৃঢ়তা দেখিয়া মার্শেল সাহেব বিস্মিত হইলেন; তিনি তাঁহাকে ছুটী দিলেন।

এই সময়ে বর্ষাকাল, দুর্গম পথ পায় হাঁটিয়া রাত্রিকালে ঈশ্বরচন্দ্র বীরসিংহে উপস্থিত হইয়া মাতৃচরণ বন্দনা করেন। জননীর আদেশ পালন করিবার জন্য মাতৃভক্ত ঈশ্বরচন্দ্র প্রাণ বিসর্জ্জনেও কুণ্ঠিত হইতেন না। চরিতাখ্যায়কগণ বলেন, 'এই দিন পথিমধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র ভরা দামোদরের জলোচ্ছ্বাসে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া সন্তরণে নদী পার হইয়াছিলেন। তখন দামোদরে 'ঢল' নামিয়াছিল, একগাছি তৃণ পড়িলেও শতখণ্ড হইয়া যায়, ঈশ্বরচন্দ্র এই তরঙ্গ-সংগ্রামে জয়ী হইয়া পর-পারে গমন করিয়াছিলেন।' কেহ কেহ বলেন, এই অতি-রঞ্জিত আখ্যান অসত্য। পরলোকগত রায় বাহাদুর সুপণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় এই আখ্যান অসত্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

লোভশূন্যতা

সুশিক্ষক ও সুপণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাঁহার সিবিলিয়ান ছাত্রগণ অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। রবার্ট্ কষ্ট্ নামক তাঁহার এক স্নেহাস্পদ সিবিলিয়ান ছাত্রের অনুরোধে তাঁহার নামে দুইটি শ্লোক রচনা করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় দুইশত টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন। নির্লোভ ঈশ্বরচন্দ্র ঐ টাকা নিজে গ্রহণ না করিয়া সংস্কৃত কলেজে জমা

দিয়াছিলেন। ঐ টাকায় চারি বৎসর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংস্কৃত রচনার পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছিল।

সংস্কৃত কলেজে কার্য্য গ্রহণ

এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ খালি হয়। এই পদের জন্য সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন কর্ম্মকুশল লোকের প্রয়োজন হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব্বপ্রকারে উপযুক্ত বিবেচিত হইলেন। ১৮৪৬ অব্দের এপ্রিল মাসে তিনি এই কার্য্য গ্রহণ করেন। তখন সংস্কৃত কলেজে কোন প্রকার শৃঙ্খলা ছিল না। অধ্যাপক-গণ যখন খুসী কলেজে আসিতেন, তাঁহারা কেদারায় ঠেস দিয়া ঘুমাইতেন, বালকগণ তাঁহাদিগকে পাখা দিয়া বাতাস করিত। ছাত্রগণ কাহারও অনুমতি না লইয়া যখন তখন বাহিরে যাইত। এই সকল অব্যবস্থা দূর করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে মনোযোগী হইলেন। পাঠ্য পুস্তক হইতে অশ্লীল শ্লোক তুলিয়া দিয়া এবং ছাত্র-দের পঠিতব্য বিষয় যাহাতে অল্প সময়ে অনায়াসে আয়ত্ত হয় উহার ব্যবস্থা করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার চিন্তা-শীলতা ও মনস্বিতার পরিচয় দিতে লাগিলেন।

তেজস্বিতা

এই সময়ে একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় কার্য্যোপলক্ষে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবের সহিত দেখা করিতে

গিয়াছিলেন। অধ্যক্ষ মহাশয় তখন টেবিলের উপর পা তুলিয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আরাম ভোগ করিতেছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কোন প্রকার অভ্যর্থনা করিলেন না। ঈশ্বরচন্দ্র দাঁড়াইয়া আপনার বক্তব্য শেষ করিয়া চলিয়া আসিলেন, কিন্তু এই অভদ্র ব্যবহার তাঁহার অন্তরে মুদ্রিত হইয়া রহিল। কিছুদিন পরে কার্য্যোপলক্ষে কার সাহেবকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আসিতে হইয়াছিল। তিনি যখন জানিতে পারিলেন যে, কার সাহেব আসিতেছেন তখন তিনি তাঁহার চটি-পরা পা দুখানি টেবিলে তুলিয়া দিয়া চেয়ারে হেলান দিয়া বসিলেন। বলা বাহুল্য তিনি কার সাহেবকে কোন প্রকার অভ্যর্থনা করিলেন না। কার সাহেব কুপিত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই অশিষ্ট ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া অধ্যক্ষ ময়েট্ সাহেবের নিকট অভিযোগ করিলেন। তেজস্বী ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার কৈফিয়তে ময়েট্ সাহেবকে বলিয়াছিলেন—"আমি ভাবিয়াছিলাম, সুসভ্য ইংরাজী কায়দায় অভ্যর্থনা করিতে হইলে বুঝি ঐরূপ করিতে হয়। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবেরই নিকটে আমি ঐরূপ শিষ্টাচার শিখিয়াছি। সুযোগ পাইয়া আমি সাহেবের প্রতি ঐ প্রকার সম্মান দেখাইতে কৃপণতা করি নাই। ইহাতে যদি কোন দোষ হইয়া থাকে তাহা হইলে সেজন্য শিক্ষাদাতাই দায়ী। এই ঘটনায় আমার বিন্দুমাত্র দোষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তেজস্বিতা ও

আত্মসম্মান-বোধের পরিচয় পাইয়া ময়েট্ সাহেব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

কার্য্যত্যাগ

কিছুদিন পরে সংস্কৃত কলেজের কার্য্য পরিচালনা-প্রণালী লইয়া সম্পাদক বাবু রসময় দত্ত মহাশয়ের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের মতবিরোধ হয়। তেজস্বী বিদ্যাসাগর মহাশয় কার্য্যত্যাগ করিয়া বিরোধের সরল মীমাংসা করিলেন। তখন এই চাকুরীর আয়ই ছিল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একমাত্র সম্বল। এক বন্ধু তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"ভাই, রাগ করে' চাকুরী তো ছাড়্লে, এখন চল্বে কি করে'?" ঈশ্বরচন্দ্র দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—"আলুপটোল বেচ্বো, না হয় মুদীর দোকান করে' দিন চালাব, তবু যে চাকুরীতে সম্মান নাই সে চাকুরী কর্বো না।" ইহার পরে ১৮৪৯ অব্দের শেষ পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় কোন চাকুরী করেন নাই।

ফোর্ট্ উইলিয়ম্ ও সংস্কৃত কলেজ

কাহারও তাঁবেদারি করা, কাহারও মুখাপেক্ষা করা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তখন তাঁহার মত গুণবান্ পণ্ডিত সমস্ত দেশে কেহ ছিলেন না। এই জন্য অনেক দিন তাঁহাকে বসিয়া থাকিতে হইল না। যখন ফোর্ট্ উইলিয়ম্ কলেজে হেড্ রাইটারের পদ খালি হইল তখন অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেব আগ্রহান্বিত হইয়া বিদ্যাসাগর

মহাশয়কে এই পদে নিযুক্ত করেন। ইহার অল্পদিন পরে তিনি সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক-পদ লাভ করেন। পূর্ব্বে তিনি সংস্কৃত কলেজের কাজে যে-সকল বাধা পাইতেন এখন আর সেই সকল রহিল না। তিনি সর্ব্বপ্রকার সুযোগ পাইলেন। ইহার পর ১৮৫১ অব্দে তিনি মাসিক দেড়শত টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ প্রাপ্ত হইলেন।

সংস্কৃত কলেজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিধান এখন তাঁহার চিন্তার বিষয় হইল। বহু দিনের সংগৃহীত অনেকগুলি হস্তলিখিত সংস্কৃত পুঁথি নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল। অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীদের হিতের জন্য তিনি ঐ সকল পুঁথির মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করিলেন। দর্শন শাস্ত্রেরও অনেক পুস্তক মুদ্রিত হইল।

এই সময়ে যাঁহারা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করিতেন তাঁহাদের অনেকেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিক্ষক ছিলেন। অধ্যাপকগণ কেহই ঠিক সময়ে কলেজে আসিতেন না ; ইহাতে অধ্যাপনায় নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিত। অথচ বিদ্যাসাগর মহাশয় কাহাকেও কিছু বলিতে পারিতেন না। অবশেষে তিনি এক উপায় অবলম্বন করিলেন। বেলা সাড়ে দশ ঘটিকার পর কাঁহাকেও কলেজে আসিতে দেখিলে নিজে দরজায় দাঁড়াইয়া বলিতেন—"আপনি এই এলেন বুঝি ?" সপ্তাহ কাল এইরূপ তীব্র দৃষ্টি রাখিবার ফলে অধ্যাপকগণ যথাসময়ে আসিতে আরম্ভ করেন।

সংস্কৃত শিক্ষায় সকল জাতির অধিকার

প্রতিষ্ঠাকাল হইতে এতদিন সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যজাতীয় বিদ্যার্থীরা সংস্কৃত শিখিত। ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কাহারও অধিকার ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রস্তাব করিলেন,—"ধর্ম্মশাস্ত্র ভিন্ন অপর সকল শাস্ত্র এখন হইতে সকল জাতীয় বিদ্যার্থীদিগকে শিক্ষা দেওয়া হউক।" ধর্ম্মলোপের আশঙ্কায় কলিকাতা ও অপর বহু-স্থানের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উত্থাপন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার প্রস্তাবের পক্ষে শাস্ত্র হইতে এমন সুযুক্তি প্রদর্শন করিলেন যে, বিরোধীদের আপত্তি খণ্ডন করিয়া তিনিই জয়গৌরব লাভ করিলেন। তখন হইতে সংস্কৃত কলেজের প্রবেশদ্বার সকল জাতির শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে।

উপক্রমণিকা ও ঋজুপাঠ

ঈশ্বরচন্দ্র কেবল প্রতিভাশালী ছাত্র ছিলেন এমন নহে, শিক্ষাক্ষেত্রেও তিনি তাঁহার অসামান্য মনস্বিতার সুস্পষ্ট প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। দেবভাষা সংস্কৃত শিক্ষার পথে ব্যাকরণ এক প্রবল বাধা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। অনেকেই এই বাধা অতিক্রম করিয়া সংস্কৃত কাব্যের রস আস্বাদন করিতে সমর্থ হন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়

উপক্রমণিকা ব্যাকরণ রচনা করিয়া সংস্কৃত শিক্ষার পথ সুগম করিয়াছেন। সুপণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—"বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের যে উপক্রমণিকা প্রণয়ন করিয়াছেন তদ্দ্বারা দেশমধ্যে সাধারণতঃ সংস্কৃত শিক্ষার যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে বলিতে হইবে। পূর্ব্বে ইংরাজী ভাষায় কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই সংস্কৃত শিখিতে অভিলাষ হইত। কিন্তু উহার দ্বারে যে ভীষণমূর্ত্তি ব্যাকরণ দণ্ডায়মান ছিল তাহা দেখিয়া কেহই নিকটে ঘেঁসিতে পারিতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন।"

পূর্ব্বে শিক্ষার্থীদিগকে ব্যাকরণ পাঠ শেষ করিয়াই 'রঘুবংশে'র মত কঠিন কাব্য পাঠ করিতে হইত। পাঠের উপযোগী অন্য কোন সহজ পুস্তক ছিল না। এই অভাব দূর করিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত ও হিতোপদেশ প্রভৃতি পুস্তক হইতে সংকলন করিয়া 'ঋজুপাঠ' নামক তিনখানি পুস্তক প্রকাশ করেন।

গ্রীষ্মের ছুটি

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাসে দারুণ গ্রীষ্মে বিদ্যার্থীদের শরীর ও মন অবসন্ন হইয়া পড়ে। এই জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রস্তাবে এই সময়ে গ্রীষ্মাবকাশের ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে।

বেতন বৃদ্ধি ও অতিরিক্ত ইন্স্‌পেক্টরের পদলাভ

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্য্যে শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের জন্য কি করা আবশ্যক এই সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিমত জানিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার লিখিত অভিমত দাখিল করিয়াছিলেন। এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতন মাসিক তিন শত টাকা করা হয়।

শিক্ষার উন্নতির জন্য তিনি গবর্ণমেণ্টকে সর্ব্বত্র বিদ্যালয় এবং স্থানে স্থানে নর্ম্মাল স্কুল স্থাপনের পরামর্শ দিয়াছিলেন। এই সময়েই কলিকাতায় নর্ম্মাল স্কুল স্থাপিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধু সুবিখ্যাত সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় উহার প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৮৫৫ অব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতার সহিত মাসিক দুই শত টাকা বেতনে অতিরিক্ত ইন্স্‌পেক্টর নিযুক্ত হন। হুগ্‌লী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়া এই চারি জিলায় বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিদর্শনের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইল। এখন এই দুই পদে তাঁহার মাসিক বেতন হইল পাঁচ শত টাকা। তখনকার দিনে মাসে পাঁচ শত টাকা বেতন খুব অল্প লোকেরই ছিল।

দেশের লোক কি করিয়া লেখাপড়া শিখিবে, কি প্রকারে

দেশের নানাস্থানে ছোট বড় বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, দিনরাত্রি প্রাণপণে তিনি সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি নদীয়া, হুগ্‌লী, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর জিলায় ঘুরিতেন। তাঁহার চেষ্টায় ছেলেমেয়েদের জন্য বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। তাঁহার সুনাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। দেশের বড় বড় ধনী ও বিদ্বানেরা তাঁহাকে দেখিয়া শ্রদ্ধায় মাথা নত করিতেন। এত বড় লোক ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়, অথচ তাঁহার পোষাক ছিল অতি সাদাসিদা। তাঁহার পরণে মোটা কাপড়, গায়ে শাদা ধপ্ ধপে চাদর, পায়ে তালতলার চটি। এই পোষাকে তিনি সর্ব্বত্র যাইতেন। তিনি পারত পক্ষে গাড়ী ঘোড়ায় চড়িতেন না, তবে যেখানে হাঁটিতে অসমর্থ হইতেন সেখানে পাল্কীতে চড়িয়া যাইতেন। ছোট লাট হ্যালিডে সাহেবের অনুরোধে তিনি চারিবার পেণ্ট্‌লন্, চোগা, চাপ্‌কান ও পাগ্‌ড়ী পরিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। এইরূপ পোষাক পরিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেকে 'সং' বলিয়া মনে করিতেন। চতুর্থ দিনে তিনি লাট্ সাহেবকে বলিলেন—"এই আপনার সহিত শেষ দেখা।" তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"কেন পণ্ডিত, কি হইয়াছে যে আর দেখা হইবে না?" স্বাধীনপ্রকৃতি ঈশ্বরচন্দ্র বলিলেন, —"কয়েদীর মত পোষাক পরিয়া সং সাজিয়া আপনার সহিত দেখা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি ইহা পারিব না।" লাট্ সাহেব বলিলেন—"যে পোষাক পরিলে আপনার

সুখ ও সুবিধা হয় সেইরূপ পোষাক পরিয়াই আপনি আসিবেন।” তখন নানাবিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বিদ্যাসাগর মহাশয় লাট্ সাহেবের বাড়ী যাইতেন। একদিন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি লাট্ সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাদের পরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু লাট্ সাহেব তাঁহাকেই সর্ব্বাগ্রে নিজের কাছে ডাকিয়াছিলেন। লাট্ সাহেবের এইরূপ আচরণে তাঁহাদের কেহ কেহ দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। উত্তরে তিনি জানাইয়াছিলেন—“আপনারা ব্যক্তিগত কার্য্যের জন্য আমার সহিত দেখা করিতে আসেন, আর বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজকার্য্যে আমাকে সুপরামর্শ দিবার জন্য আসিয়া থাকেন।”

সাদাসিদা পোষাকপরা এই অসুন্দর মানুষটি একবার হুগ্‌লী জিলায় এক পাড়াগাঁয়ে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবার জন্য গিয়াছিলেন। তখন তাঁর দেশজোড়া নাম। সকাল-বেলা হইতেই বিদ্যালয়ে লোকের ভিড় হইতেছিল। ছেলেমেয়ে বুড়াবুড়ী সকলে রাস্তায় দাঁড়াইয়া গেল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আসিতে বিলম্ব হইতেছিল। তাঁহাকে দেখিবার জন্য যাহারা সেখানে আসিয়াছিল রৌদ্রে তাহাদের খুব কষ্ট হইতে লাগিল। অবশেষে রব উঠিল “ঐ বিদ্যাসাগর মহাশয় আস্‌ছেন।” সকলে আগ্রহের সহিত পথের দিকে তাকাইল। কিন্তু অনেকে কে বিদ্যাসাগর তাহা বুঝিতেই পারিল

না। এক প্রবীণা জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁ গা, বিদ্যাসাগর কই, তিনি তো এলেন না?" একজন বলিলেন—"ঐ বিদ্যা-সাগর মহাশয়।" প্রবীণা বিস্ময়ে তাঁহার চোখ দুইটি কপালে তুলিয়া খানিকক্ষণ বিদ্যাসাগরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, "আমার পোড়া কপাল, এই মোটা চাদর-গায়ে উড়ে বেহারা দেখ্বার জন্য রোদে ভাজা ভাজা হলুম। এর না আছে গাড়ী, না আছে ঘড়ি, না আছে চোগা চাপ্কান।"

পদত্যাগ

এই সময়ে সরকারী শিক্ষাবিভাগে কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। ডাক্তার ময়েট্ বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে গমন করিবার পরে ছোট লাট্ হ্যালিডে সাহেব শিক্ষা-সমিতিকে 'ডাইরেক্টর অব পাব্লিক্ ইন্ষ্ট্রাক্সন্' নাম দিয়া নূতন আফিসে পরিণত করেন। ইয়ং নামক এক নূতন সিবিলিয়ান এই আফিসের কর্ত্তা হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় একজন প্রবীণ শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিকে ডাইরেক্টরের পদে নিযুক্ত করিবার জন্য ছোট লাট্ সাহেবকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি নিজেই সমস্ত কাজ করিব, ইয়ং কেবল উপলক্ষ মাত্র। আপনি তাঁহাকে শিক্ষাবিভাগের কাজ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন।" ঈশ্বরচন্দ্র মধ্যে মধ্যে আফিসে গিয়া ইয়

সাহেবকে কাজ কর্ম্ম বুঝাইয়া দিতেন। কিন্তু বালিকা বিদ্যালয়-স্থাপন ও অপর নানা কাজে ইয়ং সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এমন ভাবে বাধা দিতেছিলেন যে, আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া স্বাধীনভাবে তিনি তাঁহার সহিত কাজ করিতে পারিতেছিলেন না। এইজন্য ১৮৫৮ অব্দের আগষ্ট মাসে তিনি পাঁচশত টাকা বেতনের চাকুরী অকুণ্ঠিত চিত্তে ত্যাগ করিলেন। তাঁহার এই পদত্যাগের সময়ে এক বন্ধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"বিদ্যাসাগর, তুমি ভাল কাজ করিলে না।" তিনি তাঁহাকে দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"আমি টাকা অপেক্ষা, পদমর্য্যাদা অপেক্ষা, আত্মসম্মানকে মূল্যবান্ মনে করি। যে কাজে সম্ভ্রমের অপচয় হয় আমি সে কাজ করিতে চাই না।" ছোট লাট্ হ্যালিডে সাহেবও বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পদত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন—"আপনি এত বড় সমাজসংস্কার কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন, এই বৃহৎ ব্যাপারে অর্থাভাবে অত্যন্ত ক্লেশ পাইবার সম্ভাবনা।" বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তর করিলেন—"মহাশয়, যদিও বা আপনার অনুরোধ একটু চিন্তা করিতাম, কিন্তু যখন বিপদের ভয় দেখাইতেছেন, তখন আর ও পদ কখনও গ্রহণ করিব না; ঐ যে ছাড়িয়া দিয়াছি, উহাই আমার চরম সিদ্ধান্ত।" এইরূপে তেজস্বী ঈশ্বরচন্দ্র চাকুরীর বন্ধন ছিঁড়িয়া স্বাধীনতার উন্মুক্ত পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পুরুষসিংহ ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার পদত্যাগ পত্রে আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—

"আমি স্থির করিয়াছি, আমার স্বাস্থ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন পুস্তক রচনা ও সঙ্কলনদ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত থাকিব। স্বদেশীয় জন-সাধারণের সুশিক্ষালাভ এবং তাহাদের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের সহিত যদিও আমার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ চলিয়া যাইতেছে তথাপি আমি জীবনের অবশিষ্ট সময় সেই সুপবিত্র অনুষ্ঠানের সুপ্রতিষ্ঠায় নিয়োগ করিব, এবং এই ব্রত আমার জীবনের শেষ দিনে চিতাভস্মে উদ্‌যাপিত হইবে।"

স্ত্রীশিক্ষা

নারীজাতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধায় ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয় বাল্যকাল হইতে পূর্ণ ছিল। বাল্যে মাতা ও পিতামহীকে ছাড়িয়া তিনি যখন কলিকাতায় আসিলেন তখন স্নেহশীলা রাইমণিকে তিনি তাঁহার মাতা বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার উপবাসী পিতার শুষ্কমুখ দেখিয়া মুড়কির দোকানের কর্ত্রী ফলার করাইয়া তাঁহার পিতার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বলিয়াছেন—"এমন দয়া প্রকাশ মাতৃজাতীয়াদের পক্ষেই সম্ভব।"

কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তিনি যখন দেশে বিদ্যালয় স্থাপনের সুযোগ পাইলেন, তখন তিনি স্ত্রীজাতির কথা বিস্মৃত হন নাই। নদীয়া, হুগ্‌লী, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর এই চারি জিলায় শিক্ষাবিস্তারের নিমিত্ত তিনি যেমন

বালকদের জন্য তেমন বালিকাদের জন্য অনেকগুলি পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। উদারহৃদয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার দিব্যদৃষ্টিদ্বারা তখনই দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, কেবল পুরুষ শিক্ষিত হইলে জাতি উন্নত হইবে না, নারীরও শিক্ষা লাভ করা আবশ্যক। বালিকাবিদ্যালয়স্থাপন লইয়াই তাঁহার সহিত শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর ইয়ং সাহেবের সহিত মতবিরোধ ঘটে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ছোট লাট্ হেলিডে সাহেবকে বালিকা বিদ্যালয়স্থাপনের আবশ্যকতা জ্ঞাপন করেন। তিনিও উহাতে তাঁহার সম্মতি জানাইয়াছিলেন। কিন্তু এই সম্বন্ধে তিনি কোন লিখিত আদেশ প্রদান করেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় চারি জিলায় পঞ্চাশটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। বালিকারা বিনা বেতনে পড়িত। তাহাদের পড়িবার বই, লিখিবার কাগজ, শ্লেট, পেন্সিল সমস্তই বিদ্যালয় হইতে দেওয়া হইত। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে দুইজন শিক্ষক ও একজন দাসী ছিল। ডাইরেক্টর বাহাদুর এই ব্যয় মঞ্জুর করিলেন না। সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই সমস্ত ব্যয় বহন করিতে হইত। ছোট লাট্ হেলিডে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিয়াছিলেন—"আপনি আদালতে আমার নামে নালিশ করিয়া এই টাকা আদায় করুন।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন—"আমি কখনও কাহারও নামে নালিশ করি নাই, আপনার নামে কেমন করিয়া নালিশ

করিব? ঐ টাকা আমি নিজে ঋণ করিয়া শোধ করিব।” শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষদের এইরূপ আচরণে ব্যথিত হইয়া স্বাধীনচেতা ঈশ্বরচন্দ্র কর্ম্মত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্ম্মত্যাগের পরে বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার স্থাপিত বিদ্যালয়গুলি রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহার কোন কোন ইংরাজ বন্ধু তাঁহাকে কিছু কিছু মাসিক সাহায্য করিতেন।

বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাসে দুইজন মহাত্মার নাম সোণার অক্ষরে লিখিত হইতে পারে। ইঁহাদের একজন বিদ্যাসাগর, দ্বিতীয় ব্যক্তি মহামতি বেথুন। পুণ্যশ্লোক বেথুনই কলিকাতা নগরে স্ত্রীশিক্ষার সূচনা করেন। কলিকাতা নগরের কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া ১৮৪৯ অব্দে তিনি বালিকাদের বিদ্যাশিক্ষার সুবিধার জন্য “হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়” স্থাপন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এই বিদ্যালয় বেথুনের নামে কথিত হইতেছে।

বেথুন বড় লাটের দরবারের ব্যবস্থাসচিব ছিলেন। বহু টাকা বেতন পাইতেন। কিন্তু তিনি শিশুর মত সরল ও অতিশয় অমায়িক ছিলেন। এই মহানুভব ব্যক্তি বঙ্গদেশে স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তারের নিমিত্ত আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় হুগ্‌লী, ঢাকা, কৃষ্ণনগর ও হিন্দু কলেজের সিনিয়র বিভাগের পরীক্ষায় বাঙ্গলা

রচনার পরীক্ষক ছিলেন। তিনি পরীক্ষার্থীদিগকে "স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা" বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে দিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগর কলেজের নীলকমল ভাদুরীর লিখিত রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়ায় তিনি সুবর্ণ-পদক পুরস্কার পাইয়াছিলেন। এই প্রবন্ধ সংবাদপত্রে ও শিক্ষাবিভাগের রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছিল। পারিতোষিকবিতরণ সভায় মহামতি বেথুন উৎসাহপূর্ণ বক্তৃতায় সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন।

মার্শেল, ময়েট্ প্রভৃতি শিক্ষা বিভাগের উচ্চকর্ম্মচারিগণ সকল কার্য্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। এই সূত্রে মহামনা বেথুনের সহিতও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিচয় হয়। উভয়েই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের অনুরাগী বলিয়া তাঁহাদের পরিচয় ক্রমশঃ প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বেথুনের স্থাপিত 'হিন্দু বালিকা বিদ্যা-লয়ের' উন্নতি বিধানের জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার সর্ব্বাগ্রে তাঁহার দুই কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে এই বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। আরও অনেকে এই বিদ্যালয়ে বালিকা পাঠাইয়া সৎসাহসের পরিচয় দিতে লাগিলেন। তখন যাঁহারা কন্যাদিগকে বিদ্যালয়ে পড়াইতেন তাঁহাদিগকে নানা-প্রকার নিন্দা ও দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে হইত। সংবাদ-পত্রেও তাঁহাদের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশিত হইত।

বেথুন সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দু বালিকা-বিদ্যালয়ের সম্পাদকের কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়ের কার্য্য সুন্দররূপে চলিতে লাগিল। প্রথমে এই বিদ্যালয়ের পৃথক্ বাড়ী ছিল না, ৺দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে বিদ্যালয় বসিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় গৃহনির্ম্মাণের জন্য অর্থ-সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। বেথুন সাহেবই গৃহনির্ম্মাণের অধিকাংশ অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ে বালিকারা প্রথমে বিনা বেতনে, পরে অল্প বেতনে পড়িত। শিক্ষকদের বেতন এবং গাড়ী করিয়া বাড়ী হইতে বালিকাদিগকে আনা ও তাহাদিগকে বাড়ীতে দিয়া আসা ইত্যাদি নানাপ্রকারে প্রতি মাসে অনেক অর্থের আবশ্যক হইত। উদার-হৃদয় বেথুন সন্তুষ্ট চিত্তে এই সমস্ত ব্যয় বহন করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া বেথুন অনেক সময়ে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসিতেন। তখন তিনি বালিকা-দের জন্য নানা প্রকার খেলিবার দ্রব্য লইয়া আসিতেন। ঐ সকল খেল্না বালিকাদিগকে দিয়া তিনি শিশুর মত তাহাদের সহিত খেলিতেন।

১৮৫১ অব্দে বেথুন সাহেব হুগ্‌লী জিলার জনাই গ্রামে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে যাইয়া পথে বৃষ্টিতে ভিজিয়া সহসা জ্বররোগে আক্রান্ত হন। এই রোগেই অল্পদিনমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়। বেথুনের মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর মহাশয় বালকের

মত রোদন করিয়াছিলেন। বেথুন উইল করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য বহু অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন। বন্ধু-বিয়োগে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিপন্ন হইলেন। তাঁহার স্থাপিত বিদ্যালয়টি রক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বহু ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। গবর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিংয়ের পত্নী সদাশয়া লেডিং ক্যানিং এই বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষণে সম্মত হওয়ায় এই বিদ্যালয়ের জীবন রক্ষা হইয়াছিল। নানারূপ মত-বিরোধের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিদ্যালয়ের সম্পাদকতা ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি এই বিদ্যালয়ের কল্যাণকামী ছিলেন। সুযোগ পাইলেই শিক্ষানুরাগী বন্ধুদের সহিত এই বিদ্যালয়ের বিষয়ে আলোচনা করিতেন।

মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় একদিন তাঁহার এক বন্ধুর পুত্রবধূকে ভর্ত্তি করিবার জন্য বেথুন বিদ্যালয়ে গমন করিয়াছিলেন। তখন বিদ্যালয়ের অনেক উন্নতি হইয়াছে। ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীদিগকে দেখিয়া আনন্দে তিনি অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। সেই আদিকালের এক দাসী আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সেকালের নানা কথা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চক্ষু দিয়া বেগে জলধারা পড়িতে লাগিল। তিনি পুরাতন দাসীকে নূতন বস্ত্র দিলেন, বিদ্যালয়ের ছাত্রী, শিক্ষয়িত্রী, শিক্ষকদের জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া গৃহে ফিরিলেন। বন্ধু

বেথুনের স্মৃতি তাঁহার চিত্ত ভারাক্রান্ত করিল। ঘটনাক্রমে এই সময়ে ৺চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখের ভাব দেখিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন—"আপনার অসুখ কি বাড়িয়াছে ?" তিনি উত্তর করিলেন—"না, বাড়ে নাই, যেমন ছিল তেমনি আছে।" চণ্ডী বাবু বলিলেন—"তবে আপনাকে এমন কাতর দেখিতেছি কেন ?" তিনি বলিলেন—"বেথুন স্কুলে গিয়াছিলাম, সব দেখে শুনে বড় সুখ হল।" চণ্ডী বাবু বলিলেন—"তাতে দুঃখ কি ?" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—"এতগুলি মেয়ে লেখাপড়া শিখিতেছে, তারাই আবার সেই স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতেছে, কিন্তু যে-ব্যক্তি ইহার জন্য প্রাণপাত করিয়াছিল সে দেখিল না। নিজের পদমর্য্যাদা ভুলিয়া যে বালিকাদের সঙ্গে খেলা করিত, আর নিজে ঘোড়া হইয়া হামাদিয়া বালিকাদিগকে পিঠে তুলিয়া ঘোড়া চড়াইত, যাহার পিঠের উপর বসিয়া বালিকারা খেলা করিত, সে দেখিল না !" এই বলিতে বলিতে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার অন্তরে কি আগ্রহ অনুভব করিতেন তাহা এখন আমাদের পক্ষে ধারণা করা অসম্ভব। বঙ্গীয় বালিকাদের মধ্যে কুমারী চন্দ্রমুখী বসু যখন সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম, এ উপাধি লাভ করেন তখন বিদ্যাসাগর

মহাশয় তাঁহাকে এক প্রস্থ সেক্ষপিয়রের গ্রন্থাবলী উপহার দিয়াছিলেন। পুরনারীগণের শিক্ষার জন্য বঙ্গদেশের নানা জিলায় স্ত্রীশিক্ষাবিধায়িনী যে-সকল সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল বিদ্যাসাগর মহাশয় একান্ত আগ্রহের সহিত সেইগুলির সংবাদ লইতেন।

১৮৬৬ অব্দের শেষভাগে সুপ্রসিদ্ধা কুমারী কার্পেণ্টার ভারতবর্ষে আগমন করেন। বালিকাবয়সে রাজা রামমোহন-রায়কে দেখিয়া এবং পরে বাগ্মী কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিয়া ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ জন্মিয়াছিল। ভারতবর্ষে আগমন করিয়া এই বিশ্বহিতৈষিণী নারী নানাস্থানে অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠে অনেক স্থলে তাঁহার সাদর অভ্যর্থনা হইয়াছিল। কলিকাতায় আসিয়া তিনি ভারতে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনার নিমিত্ত স্ত্রীশিক্ষানুরাগী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দেখা করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন। শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর এট্‌কিন্‌সন্‌ কুমারী কার্পেণ্টারকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন। কুমারী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার গুণে ও হৃদয়ের উদারতায় মোহিত হইলেন। তাঁহার অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার সহিত উত্তর-পাড়া বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে যাইবার জন্য সম্মত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় একখানি গাড়ীতে বালী ষ্টেশন

হইতে উত্তরপাড়া যাইতেছিলেন। উত্তরপাড়ার নিকটে এক মোড়ে তাঁহার গাড়ী উল্টাইয়া যায়। গুরুতর আঘাতে তিনি অচেতন অবস্থায় ভূপতিত হইয়া রহিলেন। রাস্তায় লোকের ভিড় হইল। সকলে 'হা' করিয়া তামাসা দেখিতেছিল। তখন কুমারী কার্পেণ্টারের গাড়ী সেখানে আসিল। তিনি নামিয়া খোঁজ লইয়া সমস্ত জানিতে পারিলেন। সেই পথের পাশে বসিয়া তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কোলে তুলিয়া লইলেন, রুমাল দিয়া তাঁহার মুখ মুছাইয়া দিয়া হাওয়া করিতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন—"আমার যখন চেতনা হইল, তখন আমার বোধ হইল যেন আমার মাতৃদেবী আসিয়া আমাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়াছেন, আর স্নেহভরে পুত্রের সেবা করিতেছেন। সশরীরে সেই একবার স্বর্গভোগ করিয়াছিলাম। সে দারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও আমি কুমারী কার্পেণ্টারের সেই স্নেহপূর্ণ বাৎসল্য লাভ করিয়া পরম তৃপ্তি অনুভব করিয়াছিলাম।"

মেট্রোপলিটন্ বিদ্যালয়

কলিকাতা নগরের শঙ্কর ঘোষ লেনে এখনও মেট্রো-পলিটন্ স্কুল ও বিদ্যাসাগর কলেজ রহিয়াছে। স্কুলের মত কলেজও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'মেট্রোপলিটন্' নামেই কথিত হইত। এই বৃহৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের কীর্ত্তিস্তম্ভ বলা যাইতে পারে। দেশের

লোককে বিদ্যাদান করিবার উচ্চ আশা অন্তরে পোষণ করিয়া তিনি নিঃস্বার্থভাবে এই বিদ্যালয়ের জন্য বহু অর্থ-ব্যয় ও পরিশ্রম করিয়াছেন। অনেকে উদরান্ন সংস্থানের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং বিদ্যালয়ের আয়দ্বারা ব্যক্তিগত সুখভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বিদ্যালয়ের জন্য নিজের উপার্জ্জিত প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, বিদ্যালয় হইতে একদিনও একটি পয়সা নিজে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার সুপরিচালনায় এই বিদ্যালয়ের এমন উন্নতি হইয়াছিল যে, অনেক সময়ে বিদ্যালয়ের তহবিলে হাজার হাজার টাকা মজুত থাকিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যালয়ের জন্য অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতেন, অথচ পারিশ্রমিক বলিয়াও বিদ্যালয় হইতে কখনও কিছু গ্রহণ করিতেন না। সময়ে সময়ে বিদ্যা-লয়ের তহবিল হইতে ধার নিয়াছেন সত্য, তবে যথাকালে ঐ ধার শোধ করিতে কখনও বিস্মৃত হন নাই।

১৮৫৯ অব্দে কলিকাতার শঙ্কর ঘোষ লেনে 'ট্রেনিং স্কুল' নামে এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। এই বিদ্যা-লয়ের পরিচালকগণ বিদ্যালয়টি সুশৃঙ্খলভাবে চালাইতে না পারিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ইহার পরিচালনের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। ১৮৬৪ অব্দে এই বিদ্যা-লয়ের নাম হইল—"হিন্দু মেট্রোপলিটন্ ইন্‌ষ্টিটিউসন্।" ১৮৬৬ অব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিদ্যালয় চালনার

সম্পূর্ণ ভার একাকী প্রাপ্ত হন। তিনি চিরজীবনই বিদ্যা-লয় পরিচালনাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সুপরিচালনায় অল্পদিনমধ্যে "মেট্রোপলিটন্" বিদ্যালয়ের অসামান্য উন্নতি হইল। প্রত্যেক বৎসরই এই বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হইতেছিল। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বিদ্যালয়টি কলেজে উন্নীত করিবার অভি-লাষী হইলেন। এই সময়ে মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের ভয়ে বালকদিগকে খৃষ্টান মিশনারীদের কলেজে পাঠাইতে অনিচ্ছুক হইতেন, অন্যদিকে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রবেতন ছিল মাসিক বারো টাকা। এত অধিক বেতন বহনের সাধ্যও তাঁহাদের ছিল না। এই কারণে অনেকেই বালক-দিগকে কলেজে বিদ্যাশিক্ষা দিতে পারিতেন না। এই দেশের বিদ্যার্থীরা যাহাতে যথাসম্ভব অল্পব্যয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারে এই মহৎ উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বিদ্যালয়টিকে ১৮৭২ অব্দে কলেজে উন্নীত করেন। তখন তাঁহার কলেজে ছাত্রদের মাসিক বেতন ছিল তিন টাকা। ১৮৭৪ অব্দের শেষভাগে যে পরীক্ষা গৃহীত হয় ঐ বৎসর এফ, এ পরীক্ষায় মেট্রোপলিটন্ কলেজের এক যুবক গুণানুসারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। 'হিত-বাদীর' ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় এই কৃতী যুবক। বিদ্যাসাগর মহাশয় মনের আনন্দে এই গুণবান্ যুবককে উৎকৃষ্টরূপে বাঁধানো স্কটের সমগ্র "ওয়েভার্লি

উপন্যাসাবলী” উপহার দিয়াছিলেন। প্রথম বৎসরেই মেট্রোপলিটনের এইরূপ আশ্চর্য্য সাফল্যদর্শনে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ সাট্‌ক্লিফ্‌ সাহেব বলিয়াছিলেন—“Pandit has done wonders” “পণ্ডিত তাক্‌ লাগাইয়া দিয়াছেন।” ১৮৮১ অব্দে মেট্রোপলিটন্‌ কলেজ হইতে ছাত্রেরা সর্ব্বপ্রথমে বি, এ পরীক্ষা প্রদান করেন। ঐ বৎসরই ষোলজন ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

বিদ্যালয় পরিচালনায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসামান্য দক্ষতা ছিল। তিনি চিরজীবন শিক্ষকতা করিয়াছেন; শিক্ষকদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। তাঁহার বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ নিয়মিত সময়ে বেতন পাইতেন, অন্য বিদ্যালয়ের সহিত তুলনায় শিক্ষকদের বেতনও অধিক ছিল। অসুস্থ হইয়া কেহ কেহ চারি পাঁচ মাসও পূরা বেতনে ছুটি পাইয়াছেন। শিক্ষকদের যোগ্যতা তিনি বেশ বুঝিতেন, যাঁহার যেমন যোগ্যতা তাঁহাকে তেমন বেতন দিতে তিনি কদাচ কুণ্ঠিত হইতেন না। শিক্ষকগণের উপর তাঁহার এই আদেশ ছিল যে, তাঁহারা ছাত্রদিগকে প্রহার করিতে পারিবেন না, মিষ্ট কথায় শান্তভাবে ছাত্রদিগকে বিদ্যালয়ের নিয়মাধীন করিতে চেষ্টা করিবেন। এই আদেশ লঙ্ঘন করার অপ-রাধে তাঁহার বিচারে একজন শিক্ষককে অবসর গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কোন শিক্ষক বা অধ্যাপক বাড়ীতে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলে তিনি প্রথমেই তাঁহাকে

জলযোগ করাইতেন, পরে অন্য কথা হইত। কখন কখন তিনি স্বহস্তে তাঁহাদিগকে আম কাটিয়া খাইতে দিতেন।

বিদ্যালয় পরিদর্শন করা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৈনিক কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তিনি কখন পরিদর্শনে যাইবেন কেহ তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারিতেন না। কোন শিক্ষক বা অধ্যাপক মনোযোগের সহিত পড়াইতেছেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় হঠাৎ সেখানে যাইয়া তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া অধ্যাপনা শুনিতেছেন, তিনি সম্মান দেখাইবার জন্য দাঁড়াইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন—"তুমি পড়াইতে পড়াইতে উঠিওনা, তুমি তোমার কর্ত্তব্য কাজ করিতে থাক।" ক্লাসে যখন কোন ছাত্রকে ঘুমাইতে দেখিতেন তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে স্থানান্তরে যাইয়া ঘুমাইতে বলিতেন। তিনি এই প্রকার পরিদর্শন করিতেন বলিয়া শিক্ষক ও ছাত্রগণ সর্ব্বদা সতর্কভাবে আপন আপন কর্ত্তব্য পালন করিতেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন দয়ার অবতার। তাঁহার বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্ম্মচারী, ভৃত্য ও ছাত্র সকলেই তাঁহার স্নেহ লাভে কৃতার্থ হইত। বিদ্যালয়ে কঠোর শাসন, বেত্র-দণ্ড প্রভৃতি ছিল না, অথচ ছাত্রগণ সাধারণতঃ সুশৃঙ্খল ও নিয়মনিষ্ঠ ছিল। কোন ছাত্র অতিশয় দুর্দ্দান্ত হইলে বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত হইত। একবার দুর্বিনীত ব্যব-হারের জন্য এক শ্রেণীর সমস্ত বালক বিদ্যালয় হইতে

বিতাড়িত হইয়াছিল। কিন্তু এইরূপ ঘটনা আর ঘটিয়াছে বলিয়া শুনা যায় না। ফলতঃ মেট্রোপলিটন্ বিদ্যালয় তখন সুশাসিত ও সুপরিচালিত বলিয়া লোকসাধারণের শ্রদ্ধাদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত সুযোগক্রমে আব্‌দারও করিত। একবার ছাত্রেরা পৌষপার্ব্বণে ছুটি চাহিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ছুটি মঞ্জুর করিলেন। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন —"তোমাদের অনেকেরই বাড়ী বিদেশে, পৌষপার্ব্বণের পিঠা পাইবে কোথায়?" ছাত্রেরা বলিল—"আপনার বাড়ীতে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, তাহাই হইবে।" বলাবাহুল্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গৃহে ছাত্রেরা প্রচুর পিষ্টক ভোজন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

সাহিত্যসেবী ঈশ্বরচন্দ্র

বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের প্রথম শিল্পী

বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় অক্ষয় কীর্ত্তিলাভ করিয়াছেন। সাহিত্যসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্ব্বে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধার মাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন-তেন-প্রকারে কতগুলা বক্তব্য বিষয় পূরিয়া দিলেই যে কর্ত্তব্য সমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্তদ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, যতটুকু বক্তব্য তাহা সরল করিয়া সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে। ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা সুন্দররূপে সংযমিত না করিলে সে ভাষা হইতে কদাচ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না। সৈন্যদলের দ্বারা যুদ্ধ সম্ভব, কেবল মাত্র জনতার দ্বারা নহে—জনতা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত-প্রতিহত করিতে থাকে, তাহাকে চালনা করাই কঠিন। বিদ্যাসাগর বাংলা

গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিছন্ন ও সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি ও কার্য্যকুশলতা দান করিয়াছেন। এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধা সকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন; কিন্তু যিনি এই সেনানীর রচনাকর্ত্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্ব্বপ্রথম তাঁহাকেই দিতে হয়।"

"বাংলাভাষাকে পূর্ব্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বর-ভার হইতে মুক্ত করিয়া তাহার পদগুলির মধ্যে অংশ যোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে সর্ব্বপ্রকারে ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনি সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটি অনতি-লক্ষ্য ছন্দঃ-স্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য ও সরল শব্দগুলি নির্ব্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য ও গ্রাম্য বর্ব্বরতা উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্য্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে বাংলাগদ্যের যে অবস্থা ছিল তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাষাগঠনে বিদ্যাসাগরের শিল্পপ্রতিভা ও সৃষ্টি-ক্ষমতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।"

কেহ কেহ মনে করেন, রামমোহন রায় বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা। ঐতিহাসিকেরা একথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, রামমোহনের জন্মের আটশত বৎসর পূর্ব্বে এইদেশে গদ্য লিখিত হইত। রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে উহার প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায়। উক্ত পুরাণখানি খৃষ্টের একাদশ শতকে লিখিত। তখনকার গদ্য অলঙ্কার-বহুল ও দুর্ব্বোধ ছিল। উহা আকারে গদ্য হইলেও পদ্যেরই অনুরূপ ছিল। এই জন্য উহা "গদ্যছন্দঃ" বলিয়া উক্ত হইত।

সে কালের সিবিলিয়ানদিগকে দেশী ভাষা শিখাইবার জন্য ফোর্ট্ উইলিয়ম্ কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সময়ে বড়লাট্ ওয়েলেস্‌লির প্রবর্ত্তনায় কতগুলি বাঙ্গলা পাঠ্যপুস্তক রচিত হইয়াছিল। তখন রামরাম বসু 'প্রতাপাদিত্য-চরিত্র' ও 'লিপিমালা'; উইলিয়ম্ কেরী 'কথোপকথন' ও 'ইতিহাস-মালা'; গোলোকনাথ শর্ম্মা 'হিতোপদেশ'; মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার 'বত্রিশসিংহাসন', 'হিতোপদেশ' ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা'; চণ্ডীচরণ মুন্সী 'তোতার ইতিহাস'; রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত্র' এবং হরপ্রসাদ রায় 'পুরুষপরীক্ষা' নামক পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকগুলি ১৮০০ হইতে ১৮১৪ অব্দমধ্যে রচিত হইয়াছিল। গদ্যসাহিত্যের আদিযুগে এই পুস্তকগুলি উক্ত সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে সহায়তা করিয়াছিল তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই সকল গ্রন্থকার সাহিত্যশিল্পী না হইলেও সাহিত্যপূজায় ইঁহারা যে-উপকরণ প্রদান করিয়াছেন উহার জন্য দেশবাসী তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। ইঁহারা কিরূপ ভাষায় পুস্তক লিখিতেন উহার একটু আভাস এই স্থলে দেওয়া গেল ঃ—

প্রতাপাদিত্য-চরিত্রের ভাষা এইরূপ—(১৮০১অব্দে রচিত)

"একপোয়া দীর্ঘ প্রস্থ নিজপূরি। তার চারিদিকে প্রস্তরে রচিত দেয়াল, পূবের দিকে সিংহদ্বার তাহার বাহিরে পেট কাটা দরজা। শোভাকার দ্বার অতি উচ্চ—আমারি সহিত হস্তি বরাবর যাইতে পারে। দ্বারের উপর এক স্থান তাহার নাম নওবৎখানা—তাহাতে অনেক অনেক প্রকার জন্ত্রে দিবারাত্রি সময়ানুক্রমে জন্ত্রিরা বাদ্য করে।"

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্রের ভাষা এইরূপ—(১৮০৫ অব্দে মুদ্রিত)

"পরে কৃষ্ণচন্দ্র রাজা হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র মত প্রজা পালন করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজ্যের লোকের দিগের কোন ব্যামোহ নাই ভৃত্যবর্গেরা নিজ নিজ কার্য্যে প্রাধান্য করিয়া কাল ক্ষেপণ করে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সুখ্যাতির সীমা নাই।"

ফোর্ট্ উইলিয়ম্ কলেজের অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রচিত প্রবোধচন্দ্রিকার ভাষা—(১৮১৩ অব্দে মুদ্রিত)

"কোকিল কলালাপবাচাল যে মলয়ানিল, সে উচ্ছল চ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।"

চণ্ডীচরণ মুন্সী রচিত তোতার ইতিহাসের ভাষা—"কতক

দিবস পরে ভগবান্ সৃষ্টিকর্ত্তা সূর্য্যের ন্যায় বদন চন্দ্রের ন্যায় কপাল অতি সুন্দর এক পুত্র তাহাকে দিলেন। আমদ্ সুলতান ঐ সন্তান পাইয়া বড় প্রফুল্ল চিত্তে পুষ্পবৎ বিকশিত হইয়া সেই নগরস্থ প্রধান লোক আর মন্ত্রী ও পণ্ডিত এবং শিক্ষাগুরু আর ফকিরদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া বহুমূল্য খেলাৎ বস্ত্রাদি দিলেন। যখন সেই বালকের সপ্ত বৎসর বয়ঃক্রম হইল তখন আমদ্ সুলতান একজন বিদ্বান্ লোকের স্থানে পড়িবার জন্য সেই পুত্রকে সমর্পন করিলেম।"

সে-কালে যাহারা বাঙ্গলা ভাষা শিখিতে চাহিতেন সেই সকল বিদ্যার্থী যে-সকল পুস্তক পড়িতেন, উদ্ধৃত বাক্যগুলি সেই সকল পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থরচনার পূর্ব্বে এই দেশে খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকগণ বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের অনুশীলন করিতেছিলেন। বাঙ্গলা অক্ষর নির্ম্মাণ, বাঙ্গলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, সংবাদপত্র ও গ্রন্থরচনা খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকেরা এই সমস্তেরই পথপ্রদর্শক বলিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতার পাত্র। ধর্ম্মপ্রচার তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও ধর্ম্মযাজকগণ এই দেশে শিক্ষাবিস্তার ও সাহিত্যের উন্নতি বিধানের জন্য অসামান্য শ্রমস্বীকার করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

১৮১৪ অব্দে রামমোহন রায় কলিকাতা নগরে আগমন করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। ধর্ম্ম ও সমাজ-

সম্বন্ধে তিনি যে উদার মত পোষণ করিতেন লোক-সাধারণকে তাহা অবগত করাইবার জন্য বাঙ্গলা গদ্যে তাঁহাকে একে একে বত্রিশখানি পুস্তক লিখিতে হইয়াছিল। তাঁহার পুস্তকের বিষয় ছিল গভীর ও উচ্চ। সাধারণ পাঠককে এইরূপ দুরূহ বিষয় বুঝাইতে হইলে যেরূপ সরলভাবে পুস্তক লিখিতে হয় তিনি সেইরূপ সরল ভাষায় পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তিনি সাহিত্যশিল্পী ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার রচনার সংযম ও সারল্য সকলকে মোহিত করিত। তাঁহার পুস্তকগুলি দেশবাসীকে নূতন ভাব, নূতন সভ্যতা প্রদান করিতেছিল। সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় তিনি বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, অথচ তাঁহার লেখায় পাণ্ডিত্যের ঝাঁজ ছিল না। তিনি সর্ব্বত্র ধীর ও শান্তভাবে সুযুক্তিসহকারে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত সুপাঠ্য পুস্তকগুলি বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছে।

৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার রচিত 'বাঙ্গলা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাবে' লিখিয়াছেন—"রামমোহন রায় লিখিত যে কয়খানি বাঙ্গলা পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায় সেই সমস্তই শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অনুবাদ এবং পৌত্তলিক ধর্ম্মমতাবলম্বী প্রাচীন ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের সহিত বিচার। ঐ সকল বিচারে তিনি নিজের নানাশাস্ত্রবিষয়ক বিদ্যাবুদ্ধি, তর্কশক্তি, শাস্ত্রের সারগ্রাহিতা, বিনয়, গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি ভূরি ভূরি সদ্‌গুণের একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। নিবিষ্ট চিত্তে সেই সকল

অধ্যয়ন করিলে চমৎকৃত ও তাঁহার প্রতি ভক্তিরসে আপ্লুত হইতে হয়।”

রামমোহন রায় মহাশয়ের লিখিত ‘পথ্যপ্রদান,’ নামক পুস্তক হইতে তাঁহার ভাষার একটু নমুনা দেওয়া গেল—“বাস্তবিক ধর্ম্মসংহারক অথচ ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী নাম গ্রহণপূর্ব্বক যে প্রত্যুত্তর প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সমুদায়ে দুইশত অষ্টাত্রিংশৎ পৃষ্ঠসংখ্যক হয়, তাহা দশ পৃষ্ঠ পরিমিত ভূমিকা গ্রন্থারম্ভে লিখেন। এই দশ পৃষ্ঠে গণনা করা গেল যে, ব্যঙ্গ ও নিন্দাসূচক শব্দ ভিন্ন স্পষ্ট কদুক্তি বিংশতি শব্দ হইতে অধিক আমাদের প্রতি উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ সমস্ত পুস্তক প্রায় দুর্ব্বাক্যে পরিপুষ্ট হয়। ইহাতে এই উপলব্ধি হইতে পারে যে দ্বেষ ও মৎসরতায় কাতর হইয়া ধর্ম্মসংহারক শাস্ত্রীয় বিবাদচ্ছলে এইরূপ কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া অন্তঃকরণের ক্ষোভ নিবারণ করিতেছেন, অন্যথা দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ বিনা শাস্ত্রীয় বিচার সর্ব্বথা সম্ভব ছিল।”

বঙ্গসাহিত্যের সেবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় লেখনী ধারণের পূর্ব্বে আরও অনেক লেখক গ্রন্থরচনা করিয়া দীনা বঙ্গভাষার সেবা করিয়াছেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও ভাষা অনুস্বারবিসর্গবিহীন সংস্কৃত বলিয়া কথিত হইতে পারে, কাঁহারও ভাষা পারসী শব্দে পূর্ণ বলিয়া দুর্ব্বোধ, ও কাঁহারও রচনা গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট। বস্তুতঃ ইঁহাদের কেহই সাহিত্যশিল্পী ছিলেন না।

সাহিত্যশিল্পী ঈশ্বরচন্দ্রই বঙ্গসাহিত্যে সর্ব্বপ্রথমে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। তাঁহার রচিত 'বাসুদেব চরিত' বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের প্রথম আদর্শ পুস্তক বলিয়া উক্ত হইতে পারে। এই পুস্তকে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্মরূপে বর্ণিত হইয়াছেন বলিয়া পুস্তকখানি ফোর্ট্ উইলিয়ম্ কলেজে পাঠ্য হইতে পারে নাই। কিন্তু বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত এমন সুন্দর পুস্তক তখন আর একখানিও ছিল না। অনুবাদকের পাণ্ডিত্যগুণে এই পুস্তক ভাষার মধুরতায়, বর্ণনার চাতুর্য্যে, যথাযথ ভাববিন্যাসে অতি অপূর্ব্ব হইয়াছিল।

'বাসুদেব-চরিতের' কয়েক ছত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"অনন্তর অষ্টমমাস পূর্ণ হইলে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমীর অর্দ্ধরাত্রসময়ে ভগবান্ ত্রিলোকনাথ দেবকীর গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেন। তৎকালে দিক্ সকল প্রসন্ন হইল, গগনমণ্ডলে নির্ম্মল নক্ষত্রমণ্ডল উদিত হইল, গ্রামে, নগরে নানা মঙ্গলবাদ্য হইতে লাগিল। নদীতে নির্ম্মল জল ও সরোবরে কমল প্রফুল্ল হইল। বন উপবন প্রভৃতি মধুর মধুকরগীতে ও কোকিলকলকলে আমোদিত হইল; এবং শীতল সুগন্ধি মন্দ মন্দ গন্ধবহ বহিতে লাগিল। সাধুগণের আশয় ও জলাশয় সুপ্রসন্ন হইল। দেবলোকে দুন্দুভি-ধ্বনি হইতে লাগিল। সিদ্ধচারণকিন্নর-গন্ধর্ব্বগণ গীতি ও স্তুতি করিতে লাগিল। বিদ্যাধরীগণ

অপ্সরাগণের সহিত নৃত্য করিতে লাগিল। দেব ও দেবর্ষিগণ হর্ষিত মনে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। মেঘ সব মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিতে লাগিল।” দুঃখের বিষয় এই উপাদেয় পুস্তকখানি প্রকাশিত হয় নাই।

১৮৪৭ অব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনূদিত ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’ প্রকাশিত হয়। তাঁহার এই পুস্তকের রচনাপারিপাট্যদর্শনে সেই সময়ের পণ্ডিতমণ্ডলী বিস্মিত হইয়াছিলেন। ফোর্ট্ উইলিয়ম্ কলেজের অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেব একশত খানি পুস্তক তিনশত টাকায় ক্রয় করিয়াছিলেন। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে স্থানে স্থানে সমাসবহুল দীর্ঘ পদ ছিল। এইরূপ সমাসবদ্ধ দুরূহ পদ যে বাঙ্গালী পাঠকগণের উপযোগী হইবে না সাহিত্যশিল্পী ঈশ্বরচন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিয়া দ্বিতীয় সংস্করণে ঐ সকল স্থান সংশোধন করেন। ‘বেতাল পঞ্চবিংশতির’ ভাষা প্রাঞ্জল ও মধুর। এই পুস্তকের এক স্থলে আছে—

“রমণীয় বসন্তকাল উপস্থিত হইলে রাজকুমারী উপবনবিহারে অভিলাষিণী হইয়া পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাজা সম্মত হইলেন, এবং রাজধানীর অদূরে যে যোজনবিস্তৃত অতি রমণীয় উপবন ছিল, উহাকে স্ত্রীলোকের বাসোপযোগী করিবার নিমিত্ত বহুসংখ্যক লোক পাঠাইয়া দিলেন।”

‘বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে’ ৺রামগতি

ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—“এক্ষণে যে গদ্যরচনার বিশুদ্ধরীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বিদ্যাসাগরের বেতাল-পঞ্চবিংশতিই তাহার মূল কারণ। বেতালপঞ্চবিংশতির পূর্ব্বে ওরূপ প্রকৃতির বাঙ্গলা রচনা ছিল না। বিদ্যাসাগর উহার সৃষ্টিকর্ত্তা। উঁহার বেতালপঞ্চবিংশতিও বোধ হয় প্রথম বলিয়া সবিশেষ প্রযত্নে রচিত হইয়াছে, এই জন্যই উহার রচনা যেমন কোমল, মনোহর ও মধুবর্ষিণী হইয়াছে, বিদ্যাসাগরেরও অন্য কোন পুস্তকের রচনা সেরূপ হয় নাই।”

১৮৪৮ অব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের “বাঙ্গলার ইতিহাস দ্বিতীয়ভাগ” প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক মার্সম্যান সাহেবের কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। তখন এই সুলিখিত ইতিহাসখানি বিদ্যালয়ে পড়ান হইত। ১৮৫০ অব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত “জীবন-চরিত” প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকখানি চেম্বার্সের বাইওগ্রাফি হইতে অনূদিত। যাঁহাদের জন্মে পাশ্চাত্যদেশসমূহ গৌরবান্বিত হইয়াছে “জীবন-চরিতে” সেই সকল সাধু-মহাজনদের পুণ্যময় জীবনের কাহিনী ওজস্বিনী ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। বাঙ্গলাসাহিত্যের ভাষা কিরূপ সুশ্রাব্য, সুললিত ও সুমধুর হইতে পারে সাহিত্যশিল্পী ঈশ্বরচন্দ্র বেতালপঞ্চবিংশতি, বাঙ্গলার ইতিহাস, জীবনচরিত, আখ্যান-মঞ্জরী, চরিতাবলী প্রভৃতি পুস্তক রচনা করিয়া বঙ্গীয় পাঠকদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিলেন। এই সকল পুস্তক পাঠ করিয়া কেহ কেহ মনে করেন বিদ্যাসাগর মহাশয় পশ্চিমদেশীয়

চরিত্রের পক্ষপাতী। তাহারা ভুলিয়া যান যে তখন স্বদেশীয় চরিত্র সংগ্রহ করিয়া পুস্তকরচনা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে একরূপ অসম্ভব ছিল।

১৮৫১ অব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বোধোদয়" রচিত হয়। প্রথমে উহার নাম ছিল "শিশুশিক্ষা চতুর্থভাগ"। প্রথম শিক্ষার্থীদের জ্ঞাতব্য বহুবিষয় এই পুস্তকে রহিয়াছে। বহুবৎসর এই পুস্তক বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্য ছিল। তখন এই পুস্তকখানি বঙ্গদেশের প্রথম শিক্ষার্থীদের কতখানি মঙ্গল সাধন করিয়াছিল তাহা আজ অনুমান করা কঠিন।

১৮৫৫ অব্দে বঙ্গীয় পাঠকগণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "শকুন্তলা" পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলেন। রচনার সরসতায়, ভাবের প্রাচুর্য্যে, পদের লালিত্যে তখন এমন পুস্তক আর ছিল না। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' পুস্তক অবলম্বনে এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। এই বৎসরই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বিধবাবিবাহবিষয়ক পুস্তক" প্রকাশিত হয়। ১৮৫৬ অব্দে তিনি 'বর্ণপরিচয়' দুইভাগ, 'কথামালা' ও 'চরিতাবলী' রচনা করেন। এই সময়ে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরিচালিত 'তত্ত্ববোধিনী' সভার সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই সভার সংশ্রবে তিনি বাবু রাজনারায়ণ বসু, বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত প্রমুখ সাহিত্যসেবী বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। তখন তাঁহার রচিত অনেক উৎকৃষ্ট

প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রাঞ্জল গদ্যে "মহাভারত" রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পরে তিনি এই গ্রন্থরচনায় নিবৃত্ত হন। কেবল মহাভারতের উপক্রমণিকাভাগ ক্রমে ক্রমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৬২ অব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অমর লেখনী-প্রসূত "সীতার বনবাস" প্রকাশিত হয়। ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় এই পুস্তক সম্বন্ধে তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাবে" লিখিয়াছেন,—"বিদ্যাসাগর-রচিত 'সীতার বনবাস'কে অনেকে 'কান্নার জোলাপ' কহে। ঐ পুস্তকের প্রথমাংশ ভবভূতি-প্রণীত 'উত্তর চরিতে'র প্রায় অবিকল অনুবাদ, কিন্তু অপর সমুদয় ভাগ কেবল নূতনরূপ রচনাই নহে, উহাতে যে কি মধুর, কি চমৎকার ও কি অলৌকিক কাণ্ড সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনীয় নহে। বোধ হয় উহাতে এমন একটি পত্রও নাই যাহা পাঠ করিলে পাষাণেরও হৃদয় দ্রব না হয়। করুণরসের উদ্দীপনে বিদ্যাসাগরের যে কি অদ্ভুত শক্তি আছে, তাহা এক 'সীতার বনবাসে'ই পর্য্যাপ্তরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।"

অতঃপর "আখ্যান মঞ্জরী," "ভ্রান্তিবিলাস" ও "বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা" এই কয়খানি বাঙ্গলা পুস্তক প্রকাশিত হয়। "বিদ্যাসাগর-চরিত" নাম দিয়া ঈশ্বরচন্দ্র আপনার জীবনী লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঐ অসমাপ্ত

পুস্তকে জন্মকাল হইতে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ পর্য্যন্ত সময়ের জীবন-কথা বর্ণিত হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সতরখানি সংস্কৃত ও ত্রিশখানি বাঙ্গলা পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার সস্নেহ প্রতিপালনে ভিখারিণী বঙ্গভাষার দৈন্য দূর হইল। ঋষিতুল্য পিতার স্নেহে পুষ্ট ও সজ্জিত হইয়া বালিকা বঙ্গভাষার ম্লান মুখে মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল।

কত ভালবাসে কত কথা কয় চাহে কত কিছু বালিকা তাঁয়,
একে একে দিয়ে নানা অলঙ্কার সাজায়েছে ঋষি বালার কায়।
'আখ্যানমঞ্জরী' তুলি সযতনে পরাল গলায় চিকণ মালা
বাল-বিধবার অশ্রুবিন্দু দিয়ে, দিল সাজাইয়ে বরণ-ডালা।
মহাপুরুষের 'জীবন-চরিতে,' দিল করে নব কঙ্কণ তার।
মস্তকের মণি করি' সাজাইল, 'সীতা বনবাস' স্নেহোপহার।
এইরূপে কত বসন-ভূষণে সাজাল বালার নবীন দেহ
নব বেশ পরি নব আশা তাঁর, আগে এত শোভা দেখেনি কেহ।

কেহ কেহ বলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহিত্যশিল্পী হইলেও তাঁহার মৌলিকতা নাই। ইহার উত্তরে ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিয়াছেন,—"ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে, বিদ্যাসাগরের রচনাপ্রণালীর প্রাদুর্ভাবের সময়ই বাঙ্গালাভাষার পক্ষে অন্ধকার অবস্থা হইতে আলোকে প্রবিষ্ট হইবার প্রায় প্রথম উদ্যমকাল। ঐরূপকালে সকল ভাষাতেই

মূলগ্রন্থ অপেক্ষা অনুবাদগ্রন্থই অধিক হইয়া থাকে, ইহা এক সাধারণ নিয়ম; বিদ্যাসাগর সেই নিয়মের অনধীন হইতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহাকে মূলগ্রন্থ অপেক্ষা অনুবাদগ্রন্থ অধিক লিখিতে হইয়াছে। কিন্তু যিনি উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ-কৌমুদী, বিধবাবিবাহবিষয়ক পুস্তক, সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, সীতার বনবাস ও বহুবিবাহবিচার রচনা করিয়াছেন তাঁহাকে মূলরচনা করিবার শক্তিবিহীন বলা ধৃষ্টতার কার্য্য হয়।"

এই প্রসঙ্গে ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বলিয়াছেন—"বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ সকলের দ্বারা বঙ্গ-ভাষার বর্ত্তমান উন্নতির প্রথম সূত্রপাত করেন। অনেকে মনে করেন, বিদ্যাসাগরের উদ্ভাবনী শক্তি নাই, তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা অনুবাদ মাত্র। কিন্তু যিনি তাঁহার রচিত সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব এবং বিধবাবিবাহবিচার পাঠ করিয়াছেন, তিনি বিদ্যাসাগরের অসাধারণ স্বকপোল রচনা-শক্তি নাই এমন কখনই বলিতে পারিবেন না। বাঙ্গলাভাষায় বক্তৃতা করিবার সময়ে ও তাহা সমাপনকালে অনেক ইংরাজী-ওয়ালা অজ্ঞাতসারে বিদ্যাসাগরের রচিত বিধবাবিবাহ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তকের উপসংহারের অনুকরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রণীত 'সীতার বনবাসে' ভবভূতির উত্তরচরিত ও বাল্মীকির রামায়ণের কোন কোন অংশ গৃহীত হইয়াছে সত্য, কিন্তু উহাতে তাঁহার নিজেরও অনেক মনোহর রচনা আছে।

উহা তাঁহার একপ্রকার স্বকপোলরচিত গ্রন্থ বলিলেই হয়। বিদ্যাসাগর বঙ্গভাষার অনেক পরিমাণে নির্ম্মাণ ও পরিমার্জ্জনকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। বঙ্গভাষা তাঁহার কাছে অশেষ ঋণে আবদ্ধ আছে।”

বিদ্যাসাগর মহাশয় সুললিত সরল গদ্যে পুস্তক লিখিতেন, উহা পাঠ করিয়া সকলেই সহজে বুঝিতে পারিত। তাঁহার ভাষা সরল বলিয়াই অনেক পণ্ডিত উহার নিন্দা করিতেন। একবার কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে শাস্ত্রবিচার হয়। এক ব্যক্তিকে উক্ত বিচার-বিবরণ লিখিতে বলা হয়। তিনি উহা লিখিয়া একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের নিকট পাঠ করেন। পণ্ডিত মহাশয় উহা শুনিয়া অবজ্ঞার সহিত বলিলেন—“একি হয়েছে, এ যে ‘বিদ্যাসাগরী বাঙ্গলা’ হয়েছে, এ যে অনায়াসে বোঝা যায়!”

প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় সাহিত্যসম্রাট্ রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর প্রসঙ্গতঃ সাহিত্যশিল্পী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন, “বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এমন সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারেন নাই, তাঁহার পরেও কেহ পারেন নাই।”

পঞ্চম অধ্যায়

বিধবাবিবাহ-প্রবর্ত্তন

"আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম"

এই দেশের হিন্দু-বিধবারা কতদূর অসহায় তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্রের কোমল হৃদয় এই অসহায়া বিধবাদের দুঃখে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তিনি সর্ব্বস্বপণ করিয়া বিধবাবিবাহপ্রবর্ত্তনের উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন। এই বিষয়ে তিনি কতদূর দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিলেন তাঁহার পুত্র নারায়ণের বিবাহের পর ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রকে উহা এক পত্রে অতি সুস্পষ্টরূপে লিখিয়াছিলেন। পত্রে লিখিত হইয়াছিল—

"২৭শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার নারায়ণ ভবসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে এই সংবাদ মাতৃদেবীকে জানাইবে।

ইতঃপূর্ব্বে লিখিয়াছিলে, নারায়ণ (বিধবা) বিবাহ করিলে আমাদের কুটুম্ব মহাশয়েরা আহারব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, অতএব নারায়ণের বিবাহ নিবারণ করা আবশ্যক। এই বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়াছে। আমার ইচ্ছা বা অনুরোধে করে নাই। যখন শুনিলাম, সে বিবাহ করা স্থির করিয়াছে এবং
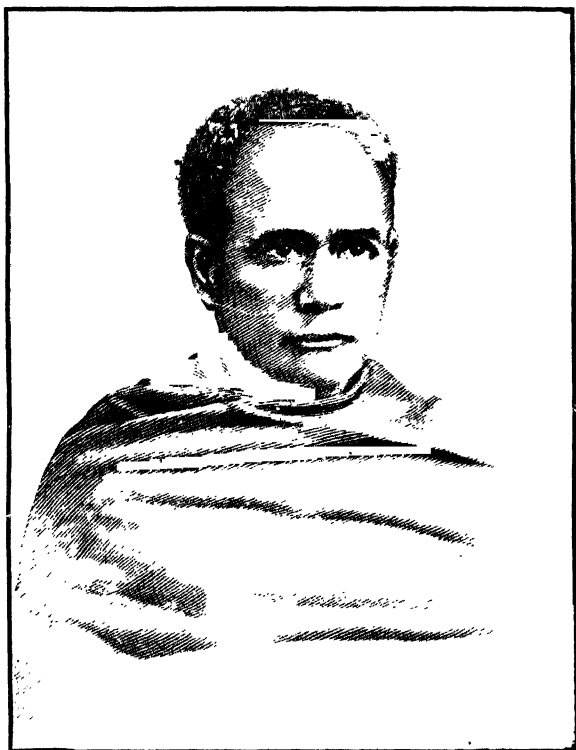
বিদ্যাসাগর (প্রৌঢ় বয়সে)

(৮৭ পৃঃ)

কন্যাও উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে বিষয়ে সম্মতি না দিয়া প্রতিবন্ধকতাচরণ করা আমার পক্ষে কোনও মতে উচিত কার্য্য হইত না। আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্ত্তক, আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না করিয়া কুমারীবিবাহ করিলে, আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না, ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম।

নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে, তাহার পথ করিয়াছে।

বিধবা-বিবাহ-প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম; জন্মে ইহা অপেক্ষা অধিক আর কোন সৎকর্ম্ম করিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই; এই বিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে, প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নই।

সে বিবেচনায় কুটুম্ব-বিচ্ছেদ অতি তুচ্ছ কথা। কুটুম্ব মহাশয়েরা আহারব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবা-বিবাহ হইতে বিরত করিতাম, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা নরাধম আর কেহ হইত না। অধিক আর কি বলিব, সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করাতে আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছি।

আমি দেশাচারের দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা করিব, লোকের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।"

সরল-হৃদয় ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রে মনুষ্যত্বের বিকাশ এত অধিক পরিমাণে হইয়াছিল যে, চিরাগত প্রথা বা দেশাচারের প্রবল পেষণে উহা বিন্দুমাত্র বিনষ্ট হইতে পারে নাই। এই বলিষ্ঠ মনুষ্যত্বের অস্ত্রে ভূষিত হইয়া তিনি শত-সহস্রের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া বিধবাবিবাহপ্রবর্ত্তনে উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন। সতীদাহপ্রথা নিবারণকালে মহাত্মা রাজা রামমোহন এইরূপ অকুতোভয়তা দেখাইয়াছিলেন।

নারীজাতির প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্তর কিরূপ শ্রদ্ধায় পূর্ণ ছিল তাহা পূর্ব্বেই স্থানে স্থানে বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি তাঁহার জননীকে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা বলিয়া ভক্তি করিতেন। স্নেহশীলা রাইমণির কথা বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া যাইত। তাঁহার অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয় বৃদ্ধবয়সে এক বালিকাকে বিবাহ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই বালিকাবধূকে দেখিয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে উক্ত গৃহ ত্যাগ করিয়া বলেন—"আর এ ভিটায় জলস্পর্শ করিব না।" তাঁহার অধ্যাপকপত্নী বিবাহের অল্পদিন পরেই বিধবা হইয়াছিলেন। এইরূপ হিন্দু-বিধবাগণ কত অসহায়, তাহাদিগকে আজীবন কিরূপ লাঞ্ছনা ও ক্লেশ

সহিতে হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের যখন বয়স বারো কি তেরো তখন তাঁহার এক বাল্যসঙ্গিনীর বৈধব্যদশাদর্শনে তিনি মনের দুঃখে কাঁদিয়াছিলেন। এইরূপ বিধবাদের বিবাহ হওয়া উচিত তখনই হয়তো তাঁহার মনে এই চিন্তার উদয় হইয়াছিল।

আপনার অল্পবয়স্কা কন্যা বা ভগিনী বিধবা হইলে আমরা সকলেই দুঃখিত হই এবং সেই বিধবা বালিকাকে বিবাহ দিতে পারিলে নিঃসন্দেহ সুখী হই। কিন্তু আমরা দেশাচারের ভয়ে এমন ভীত, দেশাচার আমাদের নৈতিক মেরুদণ্ড এমন ভাবে চূর্ণ করিয়া দিয়াছে যে, কিছুতেই সামাজিক নিগ্রহের ভয়ে বিধবা বালিকাকে বিবাহ দিতে সাহসী হই না। বিক্রমপুরের রাজা রাজবল্লভের অল্পবয়স্কা কন্যা বিধবা হইলে তিনি সেই কন্যাকে বিবাহ দিতে উৎসাহী হইয়াছিলেন। কোন কোন পণ্ডিত বিবাহ অনুমোদন করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণনগরের মহারাজা উহা ব্যবহার-বিরুদ্ধ বলিয়া অনুমোদন করেন নাই। তখন রাজা রাজবল্লভ আর কন্যার বিবাহ দিতে সাহসী হইলেন না।

তেজস্বী ঈশ্বরচন্দ্র দেশাচারের ভয়ে ভীত ছিলেন না। তিনি বিধবা-বিবাহের আবশ্যকতা ও শাস্ত্রীয় যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে লাগিল। দেশমধ্যে আন্দোলনের তরঙ্গ উত্থিত হইল।

অশেষশাস্ত্রাধ্যাপক ঈশ্বরচন্দ্র দেশবাসীকে ধর্ম্মশাস্ত্রের অননুমোদিত কোন কার্য্য করিতে আহ্বান করিতে পারেন না। তাঁহার সহজবুদ্ধি তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিল—"বিধবা বিবাহ অশাস্ত্রীয় হইতে পারে না।" এই বিশ্বাসে আশান্বিত হইয়া তিনি শাস্ত্রসিন্ধু-মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প জয়গৌরব লাভ করিল। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের গ্রন্থ হইতে বহু বচন উদ্ধার করিয়া তিনি বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিলেন। একে একে দুইখানি গ্রন্থ প্রচার করিয়া তিনি দেশবাসীকে তাঁহার অভিমত জ্ঞাপন করেন। ১৮৫৫ অব্দের ২৮এ জানুয়ারী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণীত — "বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা" এই সুযুক্তিপূর্ণ পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। সপ্তাহমধ্যে পুস্তকের প্রথম সংস্করণ শেষ হয়। এই পুস্তকের বহু প্রতিবাদ প্রকাশিত হইবার পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫৫অব্দের অক্টোবর মাসে "বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা" নামক পুস্তকের দ্বিতীয়ভাগ প্রচার করেন। এই দ্বিতীয় ভাগে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও গবেষণাশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন—

"বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা, এ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে এই বিবেচনা করা অত্যাবশ্যক যে, এদেশে বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত নাই; সুতরাং বিধবার বিবাহ দিতে হইলে এক নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত

করিতে হইবে। কিন্তু বিধবাবিবাহ যদি কর্ত্তব্যকর্ম্ম না হয় তাহা হইলে কোনক্রমে প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত হওয়া উচিত নহে। কারণ কোন্ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি অকর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন? অতএব বিধবা-বিবাহ কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি না অগ্রে ইহার মীমাংসা করা অতি আবশ্যক। যদি যুক্তিমাত্র অবলম্বন করিয়া ইহাকে কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে এতদ্দেশীয় লোকে কখনই ইহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্রে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই তাঁহারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারেন। এরূপ বিষয়ে এদেশে শাস্ত্রই সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ, এবং শাস্ত্রসম্মত কর্ম্মই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। অতএব বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম, ইহার মীমাংসা করাই সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।"

"মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনাঃ, অঙ্গিরাঃ, যম, আপস্তম্ভ, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গোতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ ইঁহারা ধর্ম্ম-শাস্ত্রকর্ত্তা। ইঁহাদের প্রণীত শাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র। ইঁহাদের প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে ভারতবর্ষীয় লোকে সেই সকল ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিয়া থাকেন।"

পরাশর-সংহিতা ধর্ম্মশাস্ত্র। এই সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসার-ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত। যে নারী স্বামীর মৃত্যু হইলে, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে, সে দেহান্তে ব্রহ্মচারীদিগের ন্যায় স্বর্গলাভ করে। মনুষ্য শরীরে যে সার্দ্ধ ত্রিকোটি লোম আছে, যে নারী স্বামীসহগমন করে, সে তৎসমকাল স্বর্গে-বাস করে।"

"পরাশর কলিযুগের বিধবাদের জন্য তিনটি বিধি দিয়াছেন—বিবাহ, ব্রহ্মচর্য্য, সহগমন। তন্মধ্যে রাজকীয় আদেশক্রমে সহগমনের প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে বিধবাদের দুইটি মাত্র পথ আছে—বিবাহ ও ব্রহ্মচর্য্য। ইচ্ছা হয়—বিবাহ করিবে, ইচ্ছা হয়—ব্রহ্মচর্য্য করিবে। কলিযুগে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করা বিধবাদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এই নিমিত্ত লোক-হিতৈষী পরাশর সর্ব্বপ্রথম বিবাহেরই বিধি দিয়াছেন। সে যাহা হউক স্বামীর নিরুদ্দেশ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার বৈগুণ্য ঘটিলে স্ত্রীলোকের পক্ষে বিবাহের স্পষ্ট বিধি প্রদর্শিত হওয়াতে কলিযুগে সেই সেই অবস্থায় বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্রসম্মত কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া অবধারিত হইতেছে।"

বিধবাবিবাহসম্বন্ধে যতপ্রকার প্রসঙ্গ উঠিতে পারে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তকে সেই সকল প্রসঙ্গ তুলিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিলেন যে, বিধবাবিবাহ সর্ব্বপ্রকারে

শাস্ত্রসিদ্ধ ও সদাচারসঙ্গত। তাঁহার অনুরাগী বন্ধুদল বিধবাবিবাহপ্রবর্ত্তনের জন্য উৎসাহিত হইলেন। কিন্তু বিধবাবিবাহ রাজকীয় আইন অনুসারে বৈধ এবং বিধবার সন্তান বৈধসন্তান বলিয়া স্বীকৃত না হইলে বিধবার সন্তানেরা পৈতৃক সম্পদে স্বত্ববান্ হইতে পারিবে না। তখন বিধবা-বিবাহ আইনসম্মত করিবার জন্য বহুব্যক্তির স্বাক্ষর-যুক্ত এক আবেদন রাজসরকারে দাখিল করা হয়। ১৮৫৬ অব্দের ২৬ এ জুলাই ভারতগবর্ণমেণ্ট বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করেন।

এই আইন প্রণীত হইবার তিন মাস পরে বাঙ্গলা ১২৫৬সালের ২৩এ অগ্রহায়ণ একটি বিধবাবিবাহ মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। তখনকার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ঐ বিবাহের নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল—

আমরা পরম আহ্লাদের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, আমাদের চিরবাঞ্ছিত বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমতঃ গত ২৩শে অগ্রহায়ণ রবিবাসরে দেশবিখ্যাত শ্রীযুক্ত রামধন তর্কবাগীশ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্যের সহিত পটলডাঙ্গা গ্রাম-নিবাসী ভদ্রবংশোদ্ভব ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশমবর্ষীয়া বিধবা কন্যার শুভ বিবাহ হয়। এই কন্যার যখন চারিবৎসর বয়ঃক্রম তৎকালে ইহার সহিত নবদ্বীপাধিপতি রাজার

গুরুবংশীয় শ্রীযুক্ত রুক্মিণীপতি চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র হরমোহন ভট্টাচার্য্যের প্রথমতঃ বিবাহ হইয়াছিল। ঐ বিবাহের দুই বৎসর পরে, ছয়বৎসর বয়সে ইহার বৈধব্য হয়। এই কন্যা পতিকুলে বাস করিত, ইহার জননী স্বীয় দুহিতার অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আপন আত্মীয়-বর্গের সম্মতি অনুসারে তাহার পুনঃ পরিণয়ক্রিয়াসম্পাদনের জন্য অতীব যত্নশীলা হয়েন এবং সেই যত্ন অনুসারে এই শুভকার্য্য সম্পন্ন হয়।

এই মহাব্যাপারে দেশমধ্যে মহাআন্দোলন উত্থিত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় নানা প্রকারে বিপন্ন হইলেন। বিরোধীরা তাঁহার প্রাণনাশের জন্য চেষ্টিত হইলেন। বৃদ্ধ পিতা ঠাকুরদাস বাড়ী হইতে দ্বারবান্ শ্রীমন্ত সর্দ্দারকে পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কলিকাতায় পাঠাইলেন। একদিন রাত্রি-কালে বাসায় ফিরিবার সময়ে ঠন্ঠনিয়া কালীতলায় কয়েক ব্যক্তি তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"কইরে ছিরে, সঙ্গে আছিস্ কি?" শ্রীমন্ত বীরদর্পে বলিল—"তুমি চল না, কে আসে যায় আমি দেখিব, তুমি চলিয়া যাও, চাকর সঙ্গে আছে।" আক্রমণকারীরা বুঝিল বিদ্যাসাগর মহাশয় সুরক্ষিত আছেন, তাহারা আর অগ্রসর হইল না।

১২৬৩ সালের ১১ই ফাল্গুন স্বনামখ্যাত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সহোদর শ্রীযুত মদনমোহন বসু ও পিতৃব্যপুত্র

দুর্গানারায়ণ বসু এক একটি বিধবা কন্যা বিবাহ করেন। এই দুই বিবাহে বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।

এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্রমশঃ নিঃস্ব ও নিঃসহায় হইতে লাগিলেন। সাময়িক উত্তেজনার বশে আন্দোলনের প্রারম্ভে যাহারা তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহারা একে একে অদৃশ্য হইতে লাগিলেন। চারিদিক্ হইতে বিদ্রূপের ধারা শ্রাবণের বারিধারার মত পুরুষসিংহ ঈশ্বরচন্দ্রের উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। অনেকেই মনে করিয়াছিল—"বিধবাবিবাহ আর চলিবে না।" কিন্তু উহা থামিল না। থাকিয়া থাকিয়া দুই একটি বিবাহ হইতে লাগিল। বিরোধীরা বলিতে লাগিল—"মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী।" ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব্বস্ব পণ করিয়া এই মহাব্রত সাধনে লাগিয়া রহিলেন।

একদিন তাঁহার বন্ধু খ্যাতনামা মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তুমি কেন একা এই কার্য্যে অগ্রসর হ'লে ?" ঈশ্বরচন্দ্র বলিলেন,—"যখন আরম্ভ করেছিলাম তখন কি আর একা ছিলাম ? অনেক লোকে মিলেমিশে একাজে হাত দিয়েছিলাম। কিন্তু যারা মায়ের ব্যাটা তারা চুপে চুপে ঘরে গেল, মায়ের ছেলে মায়ের কোলে গেল, আর আমি বাপের ব্যাটা কাজেই ধরা পড়্‌লাম।" বিদ্যাসাগর মহাশয় পরিহাসচ্ছলে যে উত্তর করিলেন উহার প্রতি বর্ণ সত্য। অধ্যবসায়ের অবতার ঈশ্বরচন্দ্র যে-কাজে হাত দিতেন সেই

কার্য্য হইতে তিনি কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেন না। এমনই অধ্যবসায়, এমনই তেজ ছিল এই 'বাপের ব্যাটার'। এই এক-গুঁয়ে বীরপুরুষ 'পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া' সুনাম কিনিবার পক্ষে ছিলেন না। তাঁহারই অভিপ্রায়মতে তাঁহার পুত্র নারায়ণ ১২৭৭ সালের ২৭এ শ্রাবণ একটি এগার বৎসরের বিধবা কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। পুত্র যখন পিতার অনুমতি গ্রহণ করিতে গিয়াছিলেন তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন —"ইহা অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যের বিষয় আমার আর কিছুই হইতে পারে না। তখন আমার মতের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?"

এই বিবাহ উপলক্ষেই পুরুষসিংহ বিদ্যাসাগর ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন—"আমি দেশাচারের দাস নহি।" তাঁহার মন সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার হইতে মুক্ত ছিল বলিয়া তিনি অন্তরে অযুত হস্তীর বল অনুভব করিতেন। ধর্ম্ম ও শাস্ত্র তাঁহার পক্ষে ছিল বলিয়া তিনি দেশাচার উপেক্ষা করিয়া নিজের জীবদ্দশায় নিজ ব্যয়ে শতাধিক বিধবা-বিবাহ সম্পন্ন করিয়াছেন; কিন্তু দেশাচারই তাঁহার এই সংস্কারকার্য্যের প্রবল বাধা ছিল। এই জন্য তিনি তাঁহার বিধবাবিবাহ গ্রন্থের শেষভাগে মনের দুঃখে লিখিয়াছেন—

"ধন্যরে দেশাচার! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে দুর্ভেদ্য দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া কি একাধিপত্য করিতেছিস্। তুই ক্রমে ক্রমে

আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিতেছিস্, ধর্ম্মের মর্ম্ম ভেদ করিতেছিস্, হিতাহিত বোধের গতিরোধ করিতেছিস্, ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিতেছিস্। তোর প্রভাবে শাস্ত্র অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে। অধর্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে। সর্ব্ব ধর্ম্মবহিষ্কৃত যথেচ্ছাচারী দুরাচারেরাও তোর অনুগত থাকিয়া কেবল লৌকিকরক্ষাগুণে সর্ব্বত্র সাধু বলিয়া গননীয় ও আদরণীয় হইতেছে। দোষস্পর্শশূন্য সাধু-প্রকৃতি পুরুষেরাও তোর অনুগত না হইয়া, কেবল লৌকিক রক্ষায় অযত্ন প্রকাশ ও অনাদর প্রদর্শন করিলেই সর্ব্বত্র নাস্তিকের শেষ, সর্ব্বদোষে দোষীর শেষ বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছেন।”

“হা শাস্ত্র! তোমার কি দুরবস্থা ঘটিয়াছে! তুমি যে-সকল কর্ম্মকে ধর্ম্মলোপকর, জাতিভ্রংশকর বলিয়া ভূয়োভূয়ঃ নির্দ্দেশ করিতেছ, যাহারা সেই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়া কালাতিপাত করিতেছে, তাহারাও সর্ব্বত্র সাধু ও ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া আদরণীয় হইতেছে। আর তুমি যে কর্ম্মকে বিহিত কর্ম্ম বলিয়া উপদেশ দিতেছ, অনুষ্ঠান দূরে থাকুক, তাহার উত্থাপন করিলেই, এককালে নাস্তিকের শেষ, অধার্ম্মিকের শেষ, অর্ব্বাচীনের শেষ হইতে হইতেছে। এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ যে বহুবিধ দুর্নিবার পাপপ্রবাহে উচ্ছলিত হইতেছে, তাহার মূল অন্বেষণে প্রবৃত্ত

হইলে, তোমার প্রতি অনাদর ও লৌকিকরক্ষায় একান্ত যত্ন ব্যতীত আর কিছুই প্রতীত হয় না।”

“হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! তোমরা আর কতকাল মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমাদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে? একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যাভিচার দোষের ও ভ্রূণ-হত্যার পাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে। আর কেন? যথেষ্ট হইয়াছে। অতঃপর নিবিষ্ট চিত্তে শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য ও যথার্থ মর্ম্ম অনুধাবনে মনোনিবেশ কর, এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলেই স্বদেশের কলঙ্ক বিমোচন করিতে পারিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে তোমরা চিরসঞ্চিত কুসংস্কারের যেরূপ বশীভূত হইয়া আছ, অভ্যাসদোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল যেরূপ কলুষিত ও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে তাহাতে হতভাগা বিধবাদের দুরবস্থা দর্শনে তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হওয়া কঠিন। ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের প্রবলস্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমরা প্রাণতুল্যা কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ, তাহারা দুর্নিবার রিপুবশীভূত হইয়া ব্যভিচারদোষে দূষিত হইলে তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ; ধর্ম্মলোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল লোক-

লজ্জাভয়ে তাহাদের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক পুনরায় বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাদিগকে সকল বিপদ্ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহ। তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জ্জয় রিপু একেবারে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানতাদোষে সংসারতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায়, কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষ-জাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায়অন্যায় বিচার নাই, হিতা-হিত বোধ নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলা জাতি জন্মগ্রহণ না করে। হা অবলাগণ, তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ বলিতে পারি না।”

“বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না” এই বিষয়েও বিদ্যাসাগর মহাশয় সুযুক্তিপূর্ণ একখানি পুস্তিকা প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার উদার সামাজিক মতের প্রতি ভারতের শিক্ষিত সমাজ চিরদিন শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছেন,

কিন্তু দেশাচার-জর্জ্জরিত এই দেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাখ্যাত শাস্ত্রসিদ্ধ ও সদাচারসঙ্গত বিধবাবিবাহ ব্যাপকভাবে এখনও প্রচলিত হয় নাই।

৺দীনময়ী দেবী (বিদ্যাসাগর-পত্নী)

১০১ পৃঃ
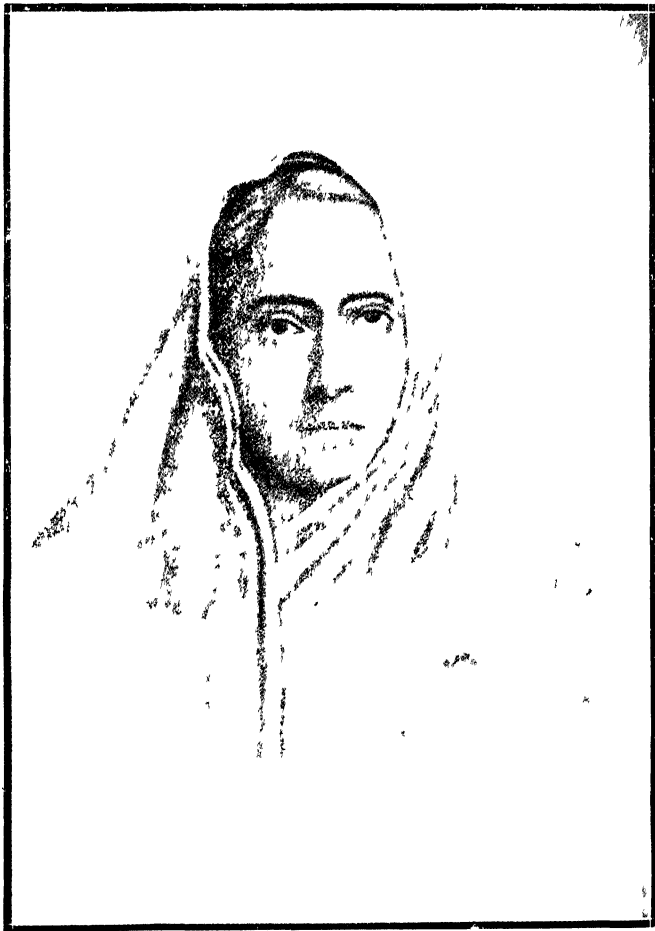
ষষ্ঠ অধ্যায়

পারিবারিক জীবন ও লোক-সেবা

দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্রের দয়া তাঁহার পরিজনবর্গ, প্রতিবেশী ও স্বদেশবাসী নরনারী সকলে তুল্যরূপে ভোগ করিয়াছেন। তাঁহার দয়া ছিল সূর্য্যরশ্মির তুল্য; উচ্চনীচ, ভদ্র ইতর সকলের উপর উহা সমভাবে পতিত হইত।

পনর বৎসর বয়সে ১৮৩৫ অব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিবাহ করেন। বিবাহের পর চৌদ্দ বৎসর পরে তাঁহার একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তারপর ক্রমে ক্রমে হেমলতা, কুমুদিনী, বিনোদিনী ও শরৎকুমারী এই চারি কন্যার জন্ম হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় কলিকাতায় একাকী বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রী পুত্রকন্যাগণসহ বীরসিংহেই থাকিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বীরসিংহ গ্রামে যাইতেন তখন তাঁহার পরিজনবর্গ-অপেক্ষা প্রতিবেশীরাই অধিকতর আনন্দিত হইত; কারণ লোকসেবাই ছিল এই মহাত্মার জীবনব্রত। তিনি যখন গ্রামে থাকিতেন তখন গ্রামবাসী নিরন্ন অন্ন, বস্ত্রহীন বস্ত্র ও রোগী ঔষধ পাইত। তিনি যখন যেখানে থাকিতেন সেখানে তাঁহার সহিত ঔষধ, নূতন কাপড়ের বস্তা ও টাকা-

কড়ি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে থাকিত। লোকসেবায় তিনি মুক্ত-হস্তে অর্থ ব্যয় করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার মাতাপিতাকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরজ্ঞানে সেবা করিতেন। মাতাপিতাকে সুখী করিবার জন্য তিনি চিরজীবন সচেষ্ট ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী ভগবতী দেবীর কথা আমরা প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিতরূপে বলিয়াছি। তিনি অসামান্য গুণশালিনী নারী ছিলেন। তাঁহার প্রসঙ্গ উঠিলে মাতৃভক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বলিতেন—"আমি যদি মায়ের গুণরাশির শতাংশের একাংশমাত্রও পাইতাম, তাহা হইলে কৃতার্থ হইতাম। আমি এমন মায়ের সন্তান, ইহা গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করি।" ঈশ্বরচন্দ্রের মাতাপিতা দুইজনেই পরিশ্রমী ও লোকের উপকারের জন্য সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ-সহনে অভ্যস্থ ছিলেন। জননী কোনরূপ অলঙ্কার পছন্দ করিতেন না। দামী অলঙ্কার-ব্যবহারে অহঙ্কার বাড়ে, দরিদ্রের প্রতি উপেক্ষার ভাব জন্মে বলিয়া জননী ভগবতী দেবী উহা পরিতে চাহিতেন না। এমন কি, মিহিসূতার কাপড়ও তিনি ভালবাসিতেন না। কলি-কাতা হইতে কখনও কখনও ঐরূপ কাপড় আসিলে তিনি বিরক্তি বোধ করিতেন। দরিদ্র-বন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এ বিষয়ে দেবী মাতার সুযোগ্য সন্তান ছিলেন; তিনি চিরদিন দরিদ্রের মত পোষাক পরিয়াছেন, কখনও বিলাসী ধনীর পরিচ্ছদের অনুকরণ করেন নাই। বিদ্যা-

সাগর মহাশয়ের বীরসিংহের বাড়ী পুড়িয়া যাওয়ার পরে অনেকে তাঁহাকে পাকা বাড়ী তৈয়ার করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন—"গরীব বামুণের ছেলের পাকা বাড়ী, শুন্‌লে লোকে হাস্‌বে যে। কোন রকমে মাথা রাখ্‌বার একটু স্থান হ'লেই হ'বে।"

সুযোগ্য পুত্রের অভিপ্রায়মতে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বীরসিংহ গ্রামে অনেক বৎসর বাস করেন। এই সময়ে তাঁহার জননী দুর্গাদেবীর অন্তিমকাল উপস্থিত হইল। বীরসিংহ হইতে তাঁহাকে সালিখায় গঙ্গাতীরে আনয়ন করা হয়। বৃদ্ধা গঙ্গাতীরে গঙ্গাজল পান করিয়া বিশ দিন জীবিতা ছিলেন। মহাসমারোহে তাঁহার শ্রাদ্ধোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ আন্দোলনে লিপ্ত ছিলেন; বিরোধীরা এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে নানাপ্রকার বিঘ্ন ঘটাইতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। তথাপি শ্রাদ্ধদিনে ব্রাহ্মণ, কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধবে প্রায় তিন হাজার ব্যক্তি ফলাহার ও পর দিবস প্রায় দুই হাজার ব্যক্তি অন্ন ভোজন করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সহোদরদিগকে অতিশয় ভালবাসিতেন। তিনি চিরজীবন তাঁহাদের ও পরিজনবর্গের সুখ চিন্তা করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার পারিবারিক জীবন সুখশান্তিময় ছিল না। ভাই দীনবন্ধু সংস্কৃতযন্ত্র ও তৎসংক্রান্ত

পুস্তকালয়ের অংশ লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বিবাদ করিয়াছিলেন। বিচারে দীনবন্ধুর দাবী অগ্রাহ্য হইয়াছিল। একসময়ে তিনি তাঁহার সহোদর ও স্বগ্রামবাসীদের নিকট হৃদয়-বিদারক দুর্ব্ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—"তোমরা আমাকে দেশত্যাগী করাইলে।" মনের দুঃখে বিদ্যাসাগর মহাশয় মাতাপিতা, সহধর্ম্মিণী ও সহোদরদিগের নিকট চিরবিদায় চাহিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। একমাত্র পুত্র নারায়ণকেও তিনি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া নারায়ণ তাঁহার ঋষিতুল্য পিতাকে লিখিয়াছিলেন—"যে-ব্যক্তি সহিষ্ণুতার আধার, যাঁহার শরীরে মায়াদেবী চিরবিরাজিতা, পরের দুঃখ শুনিলে যাঁহার চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রু বিগলিত হইয়া থাকে, সেই দয়াশীল মহাপুরুষ নিজের হতভাগ্য অনুতাপানলে দগ্ধ ভগ্নহৃদয় একমাত্র পুত্রকে অসঙ্কোচে ভাসাইয়া দিবেন একথা ভ্রমক্রমেও মনে স্থান দিতে ইচ্ছা হয় না।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাংসারিক জীবন অশান্তিপূর্ণ ছিল, কিন্তু তিনি তাঁহার পরিজনবর্গের প্রতি কদাচ উদাসীন ছিলেন না। তাঁহার দয়া ও স্নেহমমতা নীরবে চিরজীবন তাঁহাদের প্রতি বর্ষিত হইয়াছে। দুঃখীর দুঃখ নিবারণ যাঁহার জীবনব্রত, তিনি কি স্ত্রীপুত্র, আত্মীয়স্বজনের দুঃখে উদাসীন থাকিতে পারেন? পিতা ঠাকুরদাসের অভিপ্রায়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার পিতাকে কাশীধামে রাখিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে মাতা ভগবতী দেবীও সেখানে গমন করেন। কিন্তু কাশীবাস তাঁহার ভাল লাগিল না বলিয়া তিনি নানাতীর্থ ভ্রমণ করিয়া বীরসিংহে ফিরিয়া আইসেন। ঠাকুরদাসকেও তিনি দেশে ফিরাইয়া আনিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি উহাতে সম্মত হইলেন না। ভগবতী দেবী স্বামীকে বলিয়াছিলেন—"তোমার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। আমি যেখানেই থাকি এই কাশী আসিয়া তোমার আগে মরিব। তাই বলিতেছি, এখন বাড়ী চল।" ভগবতী দেবীর কথাই ফলিয়াছিল। ঠাকুরদাসের কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া ভগবতীদেবী পুত্র দীনবন্ধু ও শম্ভুচন্দ্রকে লইয়া কাশী গমন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতার সেবা করিবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইলেন। পিতা তখন আরোগ্য লাভ করিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় ও মাতাকে পিতার সেবার জন্য রাখিয়া ১২৭৭ সালের ১৫ই ফাল্গুন ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় ফিরিয়া আইসেন। এই বৎসরের শেষদিন ভীষণ ওলাউঠা রোগে হঠাৎ পুণ্যবতী ভগবতী দেবী প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে স্ত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ঠাকুরদাস বিষণ্ণ মুখে বলিয়াছিলেন—"তোমায় আমি আর কি আশীর্ব্বাদ করিব? তুমি পুণ্যবতী, আপনার পুণ্যে আপনি আগে চলিলে, তোমারই জিত হইল।"

জননীর মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর মহাশয় বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ছোট শিশুর মত সর্ব্বদা কাঁদিতেন।

জননীর মৃত্যুকালে কাছে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতে পারিলেন না, ইহাই ছিল তাঁহার পরম দুঃখের কারণ। মাতৃশ্রাদ্ধ শেষ করিয়া তিনি একবৎসরের জন্য সর্ব্বপ্রকার সুখ বর্জ্জন করিয়া নির্জ্জনে বাস করিতে লাগিলেন; স্বহস্তে নিরামিষ পাক করিয়া এক বেলা আহার করিতেন; ছাতা, কোমলশয্যা ব্যবহার করিতেন না। মাতৃভক্ত ঈশ্বরচন্দ্র তখন দেবীমাতার গুণাবলী ধ্যান করিতেন। প্রসঙ্গক্রমে কেহ তাঁহার মাতার কথা তুলিলে তিনি কাঁদিয়া আকুল হইতেন। মাতার মৃত্যুর পরে তিনি অনেক কাল কাশী যাইতে সম্মত হন নাই। ১২৮২ সালের পৌষ মাসে পিতা ঠাকুরদাস লিখিলেন—"আমার বয়স এখন তিরাশী হইল, বিশেষতঃ এই অবসন্ন সময়ে সর্ব্বদা আমার ভ্রান্তি হইয়া থাকে। তুমি আমার বংশের শ্রেষ্ঠ, এতাবৎকাল তুমি আমার ভরণপোষণ প্রভৃতি করিতেছ, এক্ষণে আমার মানস তোমার মুখ দর্শন করি। অতএব লিখি, যদি তুমি সুস্থ থাক, তাহা হইলে ইতিমধ্যে এখানে একদিনের জন্য আসিয়া আমার মানস পূর্ণ করিবে। ইতি ৫ই পৌষ।" এই পত্র পাইয়া অগৌণে বিদ্যাসাগর মহাশয় কাশীধামে গমন করিলেন। বৃদ্ধ পিতার সকল প্রকার সুখ ও সুবিধার সুব্যবস্থা করিয়া তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। তারপর ১৪ই চৈত্র পিতার কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া আবার কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। ১২৮৩ সালের

১লা বৈশাখ ঠাকুরদাস প্রাণত্যাগ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র পিতার শোকে কাতর হইয়া অনাথ বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। জীবনের দেবতাকে হারাইয়া ভক্ত-সেবক শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। অশান্ত মনে পিতার অন্ত্যেষ্টি সমাপন করিয়া কয়েকদিনমধ্যে তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়া শ্রাদ্ধাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ইহার পরে নির্জ্জনে জ্ঞানচর্চ্চায়ই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত।

লোকসেবা

"জীবের মধ্যেই শিব রহিয়াছেন, জীবের সেবাই শিবের সেবা" এই তত্ত্ব বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন বুঝিয়াছিলেন এমন আর কে বুঝিয়াছেন তাহা বলা দুঃসাধ্য। দরিদ্র-বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যকাল হইতে চিরজীবন দরিদ্রনারায়ণের সেবা করিয়াছেন। তিনি যখন বালক তখনই তাঁহার হৃদয় ছিল দয়ার খনি। ছাত্রাবস্থায় তিনি যখন বাড়ী যাইতেন তখন প্রথমে তাঁহার শিক্ষক কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেন। পরে প্রতিবাসী-দের বাড়ী বাড়ী যাইয়া সকলের খোঁজ লইতেন। কেহ পীড়িত হইয়াছে দেখিলে তিনি তাহার সেবা করিতেন। প্রতিবাসীরা তখনই তাঁহাকে 'দয়াময়' বলিত। বস্তুতঃই তিনি দয়াময় ছিলেন, একটি কুকুর বা বিড়াল মরিলেও তিনি কাঁদিয়া আকুল হইতেন।

একবার তিনি বীরসিংহ হইতে কলিকাতা আসিবার পথে দেখিলেন, এক বৃদ্ধ কৃষক মোট মাথায় করিয়া শ্রান্ত-ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, বুড়ার পুত্র তাহার মাথায় এই বোঝা চাপাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে ; বৃদ্ধের বাড়ী তিন ক্রোশ দূর, এই মোট বহন করিতে বৃদ্ধের বড়ই কষ্ট হইতেছে। ঈশ্বরচন্দ্র সেই বোঝা আপন মস্তকে তুলিয়া লইয়া বৃদ্ধের বাড়ী পঁহুছাইয়া দিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন কলিকাতা ছিলেন তখন একসময়ে তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে কোন ভদ্রলোকের বাড়ীর চাকরের ওলাউঠা হয়। ভদ্রলোক চাকরটিকে রাস্তার ধারে বাহির করিয়া রাখেন। এই রোগীর মুখে এক ফোঁটা জল দিবে এমন লোকও কেহ ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয় রোগীকে তুলিয়া আনিয়া আপনার বিছানায় শোয়াই-লেন ; চিকিৎসক ডাকিয়া তাহার চিকিৎসা ও যথোচিত সেবার ব্যবস্থা করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেবায় লোকটির জীবন রক্ষা হইয়াছিল।

একদিন সকাল বেলা এক মেথর আসিয়া দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্রকে জানাইল—"বাবা, আমার ঘরে মেথরাণীর ওলাউঠা হইয়াছে, তুমি কিছু না করিলে আর তাহার বাঁচিবার আশা নাই।" তিনি তৎক্ষণাৎ ঔষধ ও লোকসহ সেই মেথরের ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সারাদিন

চিকিৎসা ও সেবা করিয়া মেথরাণীকে একরূপ সুস্থ করিয়া সন্ধ্যার সময়ে তিনি ঘরে ফিরিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সময় সময় কর্ম্মটারে বাস করিতেন। এখানে সাঁওতালেরা তাঁহার প্রতিবেশী ছিল। এই সরল-স্বভাব সাঁওতালদের তিনি খুব ভালবাসিতেন। তিনি ছিলেন ইহাদের কাহারও দাদা, কাহারও বাবা। আমের সময় ইহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে পেট ভরিয়া আম খাইতে পাইত। কখন কখন তিনি ইহাদের জন্য বর্দ্ধমান হইতে সীতাভোগ, কলিকাতা হইতে খেজুর লইয়া যাইতেন। পূজার সময়ে তিনি তাহাদিগকে কাপড় দিতেন। কাহারও অসুখ হইলে তাহাকে দেখিতে যাইতেন, ঔষধ পথ্য দিতেন, ভালবাসিয়া গায়ে হাত বুলাইতেন। সাঁওতালেরা অনেক সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত আব্দার করিত। একদিন এক সাঁওতাল তাহার এক আত্মীয়াকে লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে উপস্থিত হইয়া বলিল,—"ইহাকে একখানা নূতন কাপড় দেও।" কৌতুক করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—"কাপড় নেই, থাক্‌লেই বা তোকে দেবো কেন?" সাঁওতাল বলিল—"না, দিতেই হবে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—"কোথায় পাব কাপড়?" সাঁওতাল বলিল—"দে তোর চাবি, সিন্দুক খুলে দেখ্‌ব।" তিনি চাবি ফেলিয়া দিলেন। সাঁওতাল সিন্দুক খুলিয়া দেখিল—অনেক কাপড়। সে বলিল—"বাস্‌রে, এই যে কত কাপড়।" একখানি ভাল কাপড় নিয়া সে তার আত্মীয়াকে দিল।

একদিন সকালবেলা বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতা সহরের হেদোর কাছে বেড়াইতেছিলেন, তখন দেখিলেন এক ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নান করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছেন। তিনি তাহাকে ডাকিয়া তাহার দুঃখের কারণ জানিতে চাহিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পায়ে চটি জুতা, গায়ে মোটা চাদর; তাঁহাকে অতি সামান্য লোক ভাবিয়া তিনি কিছু বলিতে চাহিতেছিলেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় পীড়াপীড়ি করার অবশেষে ব্রাহ্মণ বলিলেন—"আমি এক ব্যক্তির কাছে আড়াই হাজার টাকা ধার করে মেয়ের বিবাহ দিয়েছি। সে টাকা শোধ করতে পারিনি বলে তিনি নালিশ করেছেন।" প্রশ্ন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় মামলার নম্বর, তারিখ ইত্যাদি জানিয়া লইলেন। তিনি তার পরদিনই চুপে চুপে ঐ আড়াই হাজার টাকা আদালতে জমা দিলেন। মামলার দিন চিন্তিত মনে ব্রাহ্মণ আদালতে উপস্থিত হইলেন; তিনি যখন শুনিলেন যে তাহার দেনা শোধ হইয়া গিয়াছে তখন তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কে যে তাহার ঋণ শোধ করিলেন তিনি তাহা কিছুতেই জানিতে পারিলেন না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার অসাধারণ দয়াদ্বারাই লোকের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের অভ্যন্তরে করুণার উৎস প্রবাহিত হইত। এই করুণার জন্য লোকে ঈশ্বরচন্দ্রকে দয়ার সাগর বলিত ও দেবতার মত ভক্তি করিত।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন ফরাসডাঙ্গায় ছিলেন, তখন

একদিন ভ্রমণসময়ে কোন এক স্ত্রীলোকের ক্রোড়ে তিনি একটি বিকলপদ শিশু দেখিতে পাইলেন। প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলেন যে, শিশুর পিতা ঐ শীর্ণপদের চিকিৎসায় অর্থ ব্যয় করিয়া এখন একান্ত দরিদ্র হইয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চিকিৎসা করাইবার জন্য শিশুকে কলিকাতায় লইয়া আসেন।

১২৭৩ সালে বঙ্গদেশের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় ঈশ্বরচন্দ্র বীরসিংহ ও উহার নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের দরিদ্রদিগকে অন্ন-দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার গৃহে বারো জন পাচক দিনরাত্রি রন্ধন এবং বিশ জনে অবিশ্রান্ত পরিবেশন করিত। ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র নিরন্ন ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িতেছে দেখিয়া ভীত হইয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে পত্র লিখিলেন। উত্তরে তিনি লিখিলেন—"যত টাকা ব্যয় হয় হউক, কেহ যেন অভুক্ত না থাকে।" দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র ভিন্ন এমন কথা আর কে লিখিতে পারেন?

দয়ার সাগরের দয়ার অমৃতরস আস্বাদন করিয়া অমরকবি মাইকেল মধুসূদন লিখিয়াছেন—

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে
দীন যে, দীনের বন্ধু।—উজ্জ্বল জগতে
হিমাদ্রির হেমকান্তি অম্লান কিরণে!
কিন্তু ভাগ্যবলে পেয়ে সে মহাপর্ব্বতে,

যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ-চরণে,
সেই জানে কতগুণ ধরে কত মতে
গিরীশ। কি সেবা তার সে সুখসদনে।
দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী,
যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
দীর্ঘশিরঃ তরুদল, দাসরূপ ধরি
পরিমলে ফুলকুল দশদিশ ভরে,
দিবসে শীতলশ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে।

কবিবর বিপন্ন হইয়া এই "মহাপর্ব্বতের সুবর্ণচরণে" আশ্রয় লইয়া মহাবিপদে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৬৪ অব্দের ২রা জুন মধুসূদন ফরাসী দেশ হইতে অনন্যোপায় হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এক পত্রে লিখিলেন—"আমি অর্থাভাবে এ দেশীয় কোন কারাগারে যাইতেছি, আর আমার স্ত্রী ও সন্তানেরা কোন অনাথ আশ্রমে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইবে। আপনাকে আমি বেশ জানি ও সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে, একজন বন্ধু ও স্বদেশীয়কে আপনি এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া মরিতে দিবেন না। দৈবানুগ্রহ ও দৈবানুগৃহীত আপনার করুণা ব্যতীত এখান হইতে আমার স্থানান্তরিত হইবার আর কোন পার্থিব সম্ভাবনা নাই।"

এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং ঋণগ্রস্ত ছিলেন। মধুসূদনের বন্ধুদের নিকট অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিয়া তিনি

বিফল মনোরথ হইলেন। তখন ঋণ করিয়া তিনি পরের ডাকে মধুসূদনকে দেড় হাজার টাকা পাঠাইলেন। যে-দিন এই টাকা পঁহুছে সেইদিন সকাল বেলা মধুসূদন তাঁহার স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন—"আজ ডাক আসিবার দিন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আজ কোন-না-কোন খবর পাইবই, কারণ যাঁহাকে আমার কথা জানাইয়াছি তিনি আর্য্যঋষির মত প্রতিভাসম্পন্ন ও মহাজ্ঞানী, ইংরাজের মত কর্ম্মকুশল ও বাঙ্গালী জননীর মত কোমল-হৃদয়।" দয়ার সাগরের দয়ায় বিপন্মুক্ত হইয়া কবিবর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন দয়ার সাগর। তাঁহার দয়ার কাহিনীও সাগরের মত অনন্ত। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বহস্তে ওলাউঠা রোগীর মল পরিষ্কার করিতে ঘৃণা বোধ করেন নাই। ভিখারিণী সাঁওতাল নারীর রুক্ষ মাথায় তিনি সাগ্রহে নিজ হস্তে তৈল মাখাইয়া দিয়াছেন। কখনও কখনও ভাল ভাল সুপক্ক ফল কিনিয়া স্বয়ং কাঙ্গালদিগকে পরিবেশন করিতেন। পথিমধ্যে পরিচিতা জেলেনীর মৎস্যের চুপ্‌ড়ি নামাইয়া দিয়া তিনি তাহার সহিত সাংসারিক সুখদুঃখের আলাপ করিতেন। রাজপথ হইতে পরিত্যক্ত অসহায় রোগীকে তিনি মাথায় তুলিয়া স্বগৃহে লইয়া যাইতেন। বিপন্না পতিতা নারীকে অসঙ্কোচে ঔষধপথ্য দিয়া তিনি সেবা করিতেন। তাঁহার দয়ায় কত বিপন্ন উদ্ধার পাইয়াছে, কত নিরন্ন অন্ন

লাভ করিয়াছে, কত উলঙ্গের লজ্জা নিবারিত হইয়াছে, কত রোগী ঔষধপথ্য পাইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শত শত দরিদ্র বালক তাঁহার দানে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছে। যে পরম দেবতা বহুরূপে প্রত্যহ আমাদের সম্মুখে আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন, জীবের প্রতি সর্ব্বপ্রকারে প্রেম প্রকাশ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই পরমেশ্বরেরই সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছেন।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা ত্যাগ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বিশেষভাবে বাঙ্গলাসাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত সংস্কৃত ও বাঙ্গলা পুস্তক বিক্রয় করিয়া তিনি মাসিক প্রায় চারিসহস্র টাকা পাইতেন। এই অর্থের অধিকাংশ লোকসেবায় ব্যয় করা হইত। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি যে দানপত্র রচনা করিয়াছিলেন উহাতে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং মৃত আত্মীয় ও বন্ধুদের পরিজন-বর্গের জন্য মাসিক ৫৬১টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। তদ্‌ভিন্ন অপর ছয় ব্যক্তির জন্য মাসিক ১০৫ টাকা বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা ছিল। উক্ত উইলে বীরসিংহের বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক ১০০ টাকা, চিকিৎসালয়ের জন্য ৫০ টাকা, উক্ত গ্রামের অনাথ ও নিরুপায়দের জন্য ৩০ টাকা, এবং বিধবা-বিবাহের জন্য মাসিক একশত টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

যে মানুষ এমন ভাবে দরিদ্রনারায়ণের সেবায় আত্মোৎসর্গ

করিয়াছিলেন সেই নর-দেবতাকেও লোকে নানা প্রকারে প্রতারিত করিত। উত্তরপাড়া হইতে এক বালক বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখিয়াছিল—"আমি বড় গরীব, আমার মা বাপ নাই, পরের বাড়ী থাকিয়া বিদ্যালয়ে পড়ি, আপনি যদি আমাকে ফর্দ্দের লিখিত বইগুলি পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে নিশ্চিন্তমনে একবৎসর পড়িতে পারি।" বিদ্যালয়ের ঠিকানায় বিদ্যাসাগর মহাশয় বই পাঠাইলেন, বালক পাইয়া প্রাপ্তি স্বীকার করিল। এই ভাবে কয়েক বৎসর সে বই নিত। পরে এক সময়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দেখা হইল। প্রসঙ্গক্রমে তিনি ছেলেটির নাম বলিলেন। প্রধান শিক্ষক মহাশয় তখন কিছু বলিতে পারিলেন না। পরদিন তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানাইলেন—"ঐ নামের কোন ছেলে বিদ্যালয়ে নাই, কিন্তু ঐ নামের এক যুবক বিদ্যালয়ের নিকটে পুস্তক, কাগজ, কলম প্রভৃতি দ্রব্য বিক্রয় করে, পীড়াপীড়ি করায় সে তাহার অপরাধ স্বীকার করিয়াছে।" ইহা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় মনের দুঃখে বলিয়াছিলেন—"যে দেশের বালক এমন প্রবঞ্চক, সে দেশের কি সহজে মঙ্গল হইবে?"

কেবল এই একটি বালক নহে, বালবৃদ্ধযুবা শত শত ব্যক্তি নানাপ্রকারে এই মহাত্মাকে প্রতারিত করিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু গরীব-দুঃখীকে মাসিক সাহায্য করিতেন। এই মাসিক বৃত্তি আটশত টাকারও অধিক ছিল।

তাঁহার এতগুলি প্রতিপাল্যকে ফেলিয়া তিনি সহজে কলিকাতা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারিতেন না। একবার অসুস্থ হইয়া এক আত্মীয়ের নিকট আড়াই হাজার টাকা রাখিয়া তিন মাসের জন্য কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিলেন। এক মাস যাইতে না যাইতে বিদ্যাসাগর মহাশয় চারিদিক্ হইতে খবর পাইতে লাগিলেন—"আমাদের মাসহারার টাকা পাইতেছি না, আমাদের উনুনে আর হাঁড়ি চড়ে না।" যাহার উপর বৃত্তি বিতরণের ভার ছিল বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে পত্র লিখিয়া কোন উত্তর পাইলেন না। অবশেষে তাঁহাকে কলিকাতায় আসিতে হইল। তিনি আত্মীয়কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —"লোকে মাসহারা পায় নাই কেন?" আত্মীয় বলিলেন, "আজ্ঞে, কাজের ভিড় ছিল, সময় করিয়া দিতে পারি নাই।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"আচ্ছা, না পারিয়াছ টাকাগুলি আনিয়া দেও, আমিই দিয়া দিতেছি।" আত্মীয় জানাইলেন, "হাঁ তা, টাকা-টা অন্য বাবদে খরচ হইয়াছে।" এই আড়াই হাজার টাকা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেই আত্মীয়ই হজম করিলেন। আত্মীয়বন্ধুদের কেহ কেহ এই মহাত্মাকে এমনভাবে প্রবঞ্চিত করিয়াছেন। এই জন্য শেষ জীবনে বিদ্যাসাগর মহাশয় মনের দুঃখে বলিতেন—"এদেশের উদ্ধার হইতে বহু বিলম্ব আছে, পুরাতন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া নূতন মানুষের চাষ করিতে পারিলে তবে এদেশের ভাল হইবে।" কেহ নিন্দা করিয়াছে

এমন কথা শুনিলে বলিতেন—"থাম, ভেবে দেখি, সে আমার নিন্দা করিবে কেন? আমি তো কখনও তার উপকার করি নাই।"

সপ্তম অধ্যায়

পরলোক-গমন

জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর বেদনা সকল মানুষকেই ভোগ করিতে হয়। বাঙ্গলা ১২২৭ অব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্ম, ১২৯৮ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়; মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৭১ বৎসর হইয়াছিল। বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। মৃত্যুর ছয় বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তিনি কঠিন উদরাময় রোগে ভুগিতেছিলেন।

প্রিয়জনের মৃত্যুবেদনাও তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয় শোক-বিদ্ধ করিয়াছিল। একটি কুকুর বা বিড়াল মরিতে দেখিলে যিনি কাঁদিয়া আকুল হইতেন, তিনি আত্মীয়বন্ধুদের মৃত্যুতে কত আঘাত পাইতেন তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। পিতামহী ও মাতাপিতার মৃত্যুতে তাঁহার বুক শোকে ভাঙ্গিয়াছিল। তবে ইঁহাদের মৃত্যুবেদনা অপ্রত্যাশিত ছিল না। কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর দীনবন্ধু, প্রিয়তমা পত্নী দীনময়ী তাঁহাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া আগে চলিয়া গিয়াছিলেন। প্রিয়বন্ধু প্যারীচরণ সরকার, শ্যামাচরণ বিশ্বাস এবং তাঁহার স্নেহভাজন কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের মৃত্যু-বেদনাও তাঁহার পক্ষে ক্লেশকর হইয়াছিল।

বিদ্যাসাগর (বার্দ্ধক্যে)

(১১৮ পৃঃ)

বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু বৎসর যাবৎ উদরাময় রোগে ভুগিতেছিলেন। এই রোগে ভুগিতে ভুগিতে শেষে এমন অবস্থা হইল যে, তাঁহার আর কিছুই হজম হইত না। বার্লি ও পালো তাঁহার পথ্য হইল। তাঁহার চিকিৎসক ডাক্তার হীরালাল ঘোষ তাঁহাকে নির্জ্জনে বাস করিবার পরামর্শ দিলেন। মৃত্যুর আট নয় মাস পূর্ব্বে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া ফরাসডাঙ্গায় গঙ্গাতীরে একখানি সুন্দর দ্বিতল বাড়ীতে কিছুদিন বাস করেন। সেখানে কিছুদিন তিনি অপেক্ষাকৃত ভালই ছিলেন। অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত তিনি এইভাবেই রহিলেন। চৈত্র মাসে দুইদিন অন্নপথ্যও করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শরীর আর কিছুতেই সুস্থ হইতেছিল না।

জ্যৈষ্ঠমাসে হঠাৎ তাঁহার বুকের একপাশে একটা বেদনা উপস্থিত হইল। কিছুতেই এই বেদনার উপশম হইতেছিল না। তখন তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। এই সময়ে ইলেক্‌ট্রো-হোমিওপ্যাথিকমতে চিকিৎসা চলিতে লাগিল। কিন্তু চিকিৎসায় কোন ফল হইল না। তিনি উদরাময় রোগের জন্য চিকিৎসকের ব্যবস্থামতে অহিফেন সেবন করিতেন। এই সময়ে আফিং খাওয়া ছাড়িয়া দেওয়ার আবশ্যক হইল। কলিকাতা নগরের কলুটোলার এক হাকিম আফিং ত্যাগ করিবার জন্য ঔষধ দিয়াছিলেন। সেই ঔষধ দুইদিন সেবন করায় বেদনা বাড়িল, হিক্কা

আরম্ভ হইল। সকলে চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। চিকিৎসার জন্য ডাক্তার বার্চ্চ ও ম্যাক্‌নেন্‌কে ডাকা হইল। তাঁহারা কহিলেন—"রোগীর উদরে ক্যান্‌সার হইয়াছে।" চিকিৎসকগণ সকলেই রোগ দুরারোগ্য বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। রোগীর আহারে একেবারেই রুচি ছিল না, কখন বেদনা বাড়ে, কখন হিক্কা উঠে, কখন কোষ্ঠ বদ্ধ হয়। এইভাবে আষাঢ়ের শেষ পর্য্যন্ত চলিল।

৩১এ আষাঢ় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার সাল্‌জার এই রোগীর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। এই সময়ে রোগীর সামান্যরূপ জ্বর ছিল, কিন্তু হিক্কা অতি প্রবল হইয়া উঠিল। ঔষধের গুণে হিক্কা কখন কখন কমিত, কিন্তু কখনও একবারে থামিত না। ডাক্তার সাল্‌জার রোগীর অবস্থা দেখিয়া নিরাশ হইলেন।

এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় গাড়ীর শব্দ শুনিতে ক্লেশ বোধ করিতেন, এইজন্য তাঁহার বাড়ীর পাশে গলিতে বিচালি বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। মিউনিসিপালিটীর ময়লাটানা গাড়ীও ওখান দিয়া চলিত না।

৩রা শ্রাবণ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিতে আসেন। তিনি তাঁহার সহিত বহু কষ্টে দুই একটি কথা কহিয়াছিলেন। দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাল্যকাল হইতেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্নেহের পাত্র ছিলেন। অন্তিম শয্যায় তিনি

যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিতে গিয়াছিলেন তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনার পাকা চুল স্পর্শ করিয়া জানাইলেন—"তোমারও এত শীঘ্র চুল পাকিয়া গেল ?" কলিকাতা সহরের তখনকার প্রধান ও অপ্রধান শত শত ব্যক্তি এই মহাত্মার অন্তিম শয্যায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার আন্তরিক স্নেহ ও সাদর অভিবাদন পাইয়াছিলেন।

৪ঠা শ্রাবণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় বিছানার উপর উঠিয়া বসিতে পারিতেন। ঐ দিন হইতে তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হইলেন। প্রতিদিন বহু চিকিৎসক তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন, পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা চলিয়া যাইতেন। ডাক্তার হীরালাল ঘোষ ও অমূল্যচরণ বসু এই দুইজনই তাঁহার চিকিৎসাকার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতেন। ডাক্তার অমূল্যচরণ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দিনরাত্রি সেবা করিতেন। ১১ই শ্রাবণ সকাল হইতে বেলা আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। অতি ভীষণ জ্বর ও তৎসহ শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইল। এইদিন কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন মহাশয় রোগপরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন —"বাহিরে অবস্থা যত মন্দ বলিয়া মনে হয়, ভিতরে তত নয়।" ১২ই শ্রাবণ সোমবার রোগী প্রায় অচেতন ছিলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার মুখে কোন বিকৃতি দেখা যায় নাই।

১৩ই শ্রাবণ মঙ্গলবার, পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরলোকগমনের পুণ্য দিন। এই দিন সকল সময়ে তিনি

সম্পূর্ণরূপে অচেতন ছিলেন। পুত্র, কন্যা, দৌহিত্র, ভ্রাতা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবর্গ সকলেই উৎকণ্ঠিতভাবে তাঁহার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। শোকের গভীর ছায়ায় দশদিক্ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। রাত্রি একাদশ ঘটিকার সময়ে নাভি-শ্বাস আরম্ভ হইল। রাত্রি দুইটা আঠার মিনিটের সময় মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রাণবায়ু অনন্তে বিলীন হইল। বঙ্গজননীর কোল শূন্য করিয়া তাঁহার পরমপ্রিয় সন্তান অমরধামে যাত্রা করিলেন।

সহসা শোকের ঝড় বহিতে লাগিল। পুত্রকন্যা প্রভৃতি পরিজনবর্গ ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বন্ধুবর্গ, সেবক ও আগন্তুকগণ কাঁদিয়া আকুল হইলেন। সেই গভীর রাত্রিকালেই এই সংবাদ নগরে ছড়াইয়া পড়িল। দলে দলে নরনারী এই পুণ্যশ্লোক মহাত্মাকে শেষ-দেখা দেখিবার জন্য 'বিদ্যাসাগর বাটী'র অভিমুখে ছুটিলেন। যে তক্তপোষখানির উপর মহাত্মার শব রক্ষা করা হইয়াছিল সকলে উহা স্পর্শ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেছিলেন। ধনি-নির্ধন, ভদ্রইতর, স্পৃশ্যঅস্পৃশ্য সকলেই যেন আপনার একান্ত আপনজনকে হারাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র লোক পিতৃহীনের মত কাঁদিয়া ব্যাকুল হইল। ইহার পূর্ব্বে কলিকাতা নগরে এমন সর্ব্বজনপ্রিয় ব্যক্তি আর মরেন নাই, কাঁহারও মৃত্যুতে নগরে এমন ভাবে আর্ত্তরব উঠে নাই। হাজার হাজার লোকের শোকাশ্রু-

ধারায় অভিষিক্ত হইয়া এই পরার্থপর মহাত্মা রণজয়ী সেনা-পতির মত আনন্দধামে যাত্রা করিলেন। প্রসিদ্ধ মহিলাকবি শ্রীমতী মানকুমারী বসু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্ত্যেষ্টিকালে নিমতলা শ্মশান ঘাটে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ-মধ্যে তিনি বলিয়াছেন—"ঐ ধূ ধূ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে, ঐ আগুনে বাঙ্গলার সম্মান-গৌরব পুড়িয়া ছাই হইতেছে। ঐ জ্বলন্ত আগুনে বাঙ্গালীর প্রধান গর্ব্ব, প্রধান অহঙ্কার, পুড়িয়া যাইতেছে। ঐ চিতার আগুনে আজ কত কি ফুরাইল। কত কাঙ্গাল-গরীব মাতাপিতা হারাইল। কত হৃদয় আজি আশাভরসাহারা হইল। শ্রাবণের মেঘ স্তম্ভিত হইয়া দেখিতেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্তম্ভিত হইয়া দেখিতেছে। ঐ চিহ্ন ফুরাইয়া আসিতেছে!"

অষ্টম অধ্যায়

চরিত্রের বিশিষ্টতা

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুণ্যচরিত্রের মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিতে করিতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন—

এ জগতে সোজাপথে চলা কি সহজ? একটা লক্ষ্য স্থির না থাকিলে কি সোজাপথে চলা যায়? যদি গগনে ধ্রুবতারা না থাকিত, তাহা হইলে নাবিকগণ কি সোজাপথে চলিতে পারিত? সেইরূপ এই সকল তেজস্বী পুরুষসিংহ যে জীবনে সোজাপথে চলিয়াছেন, তাহার মূলে কি? আমি এ জীবনে যে অল্পসংখ্যক মানুষকে সোজাপথে দেখিয়াছি, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান। আমি যখন আট বৎসরের বালক তখন প্রথমে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হয়। সেই দিন হইতে তিনি আমাকে ভালবাসিতেন এবং সেই দিন হইতে আমি তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছি। এমন সোজাপথে চলিবার মানুষ আমি অল্পই দেখিয়াছি। আমি তাঁহার অত্যুজ্জ্বল গুণাবলীর পার্শ্বে দুই একটা উৎকট দোষও দেখিয়াছি, কিন্তু সেই তেজঃপুঞ্জ চরিত্রের সোজাপথে চলা যখন স্মরণ করি, তখন আর কোনও দোষের কথা মনে থাকে না; বলি, হায়! হায়! এমন মানুষ আবার কতদিনে পাইব?

তবে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের মেরুদণ্ড কি? সে কি জিনিষ যাহা হৃদয়ে থাকাতে তিনি সোজাপথে চলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? তাহা মানবজীবনের মহত্ত্বজ্ঞান। কথাটি শুনিতে ছোট, কিন্তু ফলে অতিশয় বড়। তুমি, আমি এ জগতে কি হইব বা কোন্ স্থান অধিকার করিব, তাহা অনেকটা ইহার উপর নির্ভর করে। তুমি যদি স্বীয় জীবনকে ক্ষুদ্র করিয়া না দেখ, তবে মহত্ত্বের দিকে তোমার দৃষ্টি পড়িবে। তাহা হইলে জীবনের সামগ্রী অপেক্ষা জীবনকে বড়ই উচ্চ বোধ হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবিকা অপেক্ষা নিজ মনুষ্যত্বকে অনন্তগুণে অধিক উচ্চ পদার্থ মনে করিতেন। তাঁহার মনুষ্যত্বের প্রভাব এত অধিক ছিল যে, তিনি সেই প্রভাবে স্বদেশ ও স্বজাতির অনেক উপরে উঠিয়াছিলেন। যেমন ক্ষুদ্রকায় বনজ গুল্মসকলের মধ্যে দীর্ঘদেহ শালবৃক্ষ দণ্ডায়মান থাকে, তেমনি সেই পুরুষসিংহ নিজ মহৎ মনুষ্যত্বে সমকালীন জনগণকে বহু নিম্নে ফেলিয়া ঊর্দ্ধশিরাঃ হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। মনুষ্যত্বের বিক্রম সম্বন্ধে কেবল একজন মহাপুরুষের সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে, তিনি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। রামমোহন রায়ের মনুষ্যত্ব ভারতবর্ষে ধরে নাই, উছলিয়া জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনুষ্যত্বও দেশে ও শাস্ত্রে ধরে নাই, উছলিয়া গিয়াছিল।

তাঁহার নিজের মনুষ্যত্বের মহত্ত্ব-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে পরদুঃখ-কাতর হৃদয় ছিল; সেই জন্যই অপরের প্রতি অত্যাচার

দেখিলে, কাহাকেও অন্যায়রূপে মনুষ্যত্বের প্রাপ্য কোনও অধিকার হইতে বঞ্চিত দেখিলে, তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে অসত্য ও অন্যায়ের গন্ধও সহ্য করিতে পারিতেন না, তাহার কারণ এই, অসত্য বা অন্যায়কে তিনি মানবজীবনের পক্ষে এত হীন মনে করিতেন যে, তাঁহার চিত্ত তাহার চিন্তনেও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিত। অনেকে জানেন, তিনি এক কথায় পাঁচশত টাকার চাকুরী ছাড়িয়াছিলেন। তাহার মূলে কি? এই অদম্য, অনমনীয় মনুষ্যত্ব। ডিরেক্টর তাঁহাকে এরূপ কিছু কাজ করিতে বলিলেন, যাহা তাঁহার বিবেচনায় সত্যানুগত নহে। তিনি সে কথা ডিরেক্টরকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন; ডিরেক্টর শুনিলেন না, বলিলেন, "You must! You must!" এই শব্দদ্বয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনুষ্যত্বের উপরে জ্বলন্ত অয়োগোলকের ন্যায় পড়িল। তিনি আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। এ চাকুরী তাঁহার বিষ বোধ হইতে লাগিল; কেহই তাঁহাকে তাহাতে রাখিতে পারিল না। তৎপরে স্বয়ং লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ডাকাইয়া পুনরায় স্বীয় পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না।

বর্ত্তমানে অতৃপ্তি, ভবিষ্যৎ রচনা ও নিজ আদর্শে আসক্তি, মানব-প্রকৃতির এই গভীর রহস্যত্রয় মানবজাতির মুখপাত্র-স্বরূপ প্রত্যেক মহাজনে দৃষ্ট হইয়াছে। এই তিনটি বিদ্যা-

সাগর মহাশয়ে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তিনি হৃদয়ে ভবিষ্যতের যে ছবি দেখিতেন ও অন্তরের অন্তরে যাহা চাহিতেন তাহার সহিত তুলনায় বর্ত্তমানকে তাঁহার এতই হীন বোধ হইত যে, বর্ত্তমানের কথা উপস্থিত হইলে তিনি সহিষ্ণুতা হারাইতেন। তাঁহার জীবনের শেষভাগে যখন আর তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় খাটিবার শক্তি ছিল না, তখনও এই অতৃপ্তি ভূগর্ভশালী প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় তাঁহার অন্তরে বাস করিতেছিল। প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই ঐ অনল আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় জ্বালারাশি প্রকাশ করিত। তাঁহার কোমল ও পরদুঃখকাতর হৃদয়ে বর্ত্তমান সমাজের অসারতা, কৃত্রিমতা ও অসাধুতা এতই আঘাত করিত যে, বৃশ্চিকদংশনের ন্যায় তাঁহাকে যাতনায় অস্থির করিয়া তুলিত।

এমন কি, তিনি ক্ষোভে, দুঃখে ঈশ্বরকে গালাগালি দিতেন। একদিন তিনি কোন এক হতভাগিনী বিধবাকে দেখিয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তখন তাঁহার পরিচিত কয়েকজন বন্ধু বসিয়াছিলেন; তাঁহারা তাঁহাকে উত্তেজিত দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন,—"এই জগতের মালিককে যদি পাই, তাহ'লে একবার দেখি! এ জগতের মালিক থাকিলে কি এত অত্যাচার সহ্য করে?" এই বলিয়া কিরূপে দুষ্ট লোক ঐ বিধবাটির সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে, তাহা বলিতে লাগিলেন, ও দর দর ধারে তাঁহার দুই চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। ফল কথা এই যে,

তিনি যত সত্বর স্বদেশবাসীকে অগ্রসর দেখিতে চাহিতেন, তাহারা তত সত্বর অগ্রসর হইবার লক্ষণ দেখাইত না বলিয়া তিনি তাহাদের প্রতি অগ্নিবৃষ্টির ন্যায় বিরাগ বর্ষণ করিতেন।

বর্ত্তমানে অতৃপ্তির ন্যায় ভবিষ্যৎ রচনার শক্তিও তাঁহার ছিল। তিনি নিজ অন্তরে ভাবী ভারতের কি ছবি ধারণা করিয়াছিলেন, তাহা কোনও স্থানে সমগ্রভাবে প্রকাশ করেন নাই। ভবিষ্যৎ ভারতসমাজের একটি ছবি তাঁহার হৃদয়ে ছিল, তিনি সেই ছবির দিকে স্বদেশকে অগ্রসর করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, এবং শীঘ্র যায় না বলিয়া সহিষ্ণুতা হারাইতেছিলেন। সে ছবিটার সমগ্র আয়তন ও পরিসর নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই; কিন্তু স্থূলতঃ তাহার মূল ভাবটি নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান ভারতের যুগ-প্রবর্ত্তক ব্যক্তির ন্যায় তিনি পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে নিজ হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াই জানে; আমরা জানি তাঁহার ন্যায় প্রতীচ্য জ্ঞানে অভিজ্ঞ পুরুষ বঙ্গদেশে অতি অল্পই ছিলেন। তাঁহার সুবিখ্যাত পুস্তকালয়ই তাহার প্রমাণ। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ের সহিত তাঁহার প্রতীচ্য দর্শন, বিশেষতঃ ফরাসী-দেশের প্রসিদ্ধ কোমৎ-দর্শন বিষয়ে সর্ব্বদা বিচার হইত। একদিন বিচারান্তে বিদ্যাসাগর মহাশয় উঠিয়া গেলে, মিত্র মহাশয় বন্ধুদিগকে বলিলেন, "বাবারে, একটা মহাজন্তু! দেখ্‌লে কেমন বিদ্যাবুদ্ধির দৌড়! মানুষটার যেমন হৃদয়

তেমনি মাথা!” একথা অবাধে বলা যায় যে, তিনি প্রতীচ্য সভ্যতার সকল বিভাগ সমুচিতরূপে অনুশীলন করিয়াছিলেন কিন্তু প্রতীচ্য জগৎ হইতে যাহা কিছু জীবনের আদর্শ পাইয়াছিলেন তাহা প্রাচ্য ভাবে ও প্রাচ্য জীবনের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা করিতেন। প্রাচ্য প্রীতি ও ভক্তির উপরে প্রতীচ্য কর্ম্মশীলতা স্থাপন করিবার প্রয়াস করিতেন এই প্রাচ্যপ্রতীচ্যের একত্র সমাবেশের গুণেই তিনি বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজের মুখপাত্রস্বরূপ হইতে পারিয়াছিলেন। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের অদ্ভুত সমাবেশ করিয়া নব-সাহিত্যের আবির্ভাব করিয়াছেন, তেমনি বিদ্যাসাগর মহাশয় মানবচরিত্রের আদর্শে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমাবেশ করিয়া নব চরিত্র ও নব সমাজ গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। সে কার্য্য এখনও চলিতেছে এবং পরেও চলিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আমরা এখন চারিদিকেই বিদ্যালয় দেখিতেছি, প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র বালক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে শুনিতেছি আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, এই শিক্ষা-বিস্তারের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কত ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। তিনি যখন নিজে পাশ্চাত্য জ্ঞানের আস্বাদন পাইলেন, তখন তাহা স্বদেশবাসী-দিগকে দিবার জন্যও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। গবর্ণমেণ্টকে প্ররোচনা দিয়া তাঁহাদের সাহায্যে স্থানে স্থানে মডেল স্কুল স্থাপন করিতে লাগিলেন। কি অসুবিধাতেই তাঁহাকে কার্য্য

করিতে হইয়াছিল! না ছিল উপযুক্ত শিক্ষক, না ছিল উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক। নিজে পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন; কয়েকস্থলে টোলের পণ্ডিতদিগকে ধরিয়া ভূগোল, জ্যামিতি প্রভৃতি কিনিয়া দিয়া পড়াইয়া কাজ চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন করিয়া তাঁহাকে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইয়াছে।

তিনি যে কেবল পুরুষদিগের মধ্যেই এই প্রতীচ্য জ্ঞানালোক বিস্তার করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি বর্ত্তমান বীটন অথবা বেথুন স্কুলের সম্পাদক ছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বেও উক্ত কলেজে গিয়া বালিকাদিগকে বিধিমতে উৎসাহ দান করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন দেশের নানা স্থানে বহুসংখ্যক বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই বিষয়ে ডিরেক্টরের সহিত তাঁহার মতভেদ উপস্থিত হয়, সেই মতভেদ হইতেই মনোমালিন্য জন্মে। রামমোহন রায়ের ন্যায় তিনিও বুঝিয়াছিলেন যে, প্রাচ্যজীবনে প্রতীচ্য জ্ঞানের সমাবেশ না হইলে দেশ উঠিবে না। অতএব বলিতেছি, তিনি বর্ত্তমানে অতৃপ্ত হইয়া নিজ মনে একটা ভবিষ্যৎ রচনা করিয়া তদভিমুখে স্বদেশকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এ জগতে দুই শ্রেণীর লোকের দুই প্রকার ভাব দেখি। এক শ্রেণীর লোকের প্রকৃতিতে শ্রদ্ধার মাত্রা কিঞ্চিৎ অধিক; তাঁহারা অতীতের প্রতি এমন শ্রদ্ধান্বিত যে, বর্ত্তমানের প্রতি

যখনি তাহাদের অতৃপ্তি জন্মে, তাঁহারা আবেগের সহিত অতীতের দিকে যাইতে চান। তাঁহাদের চিত্ত অতীতের দ্বারেই ঘুরিয়া বেড়ায়; অতীতের চিন্তার মধ্যেই তাঁহারা বাস করিতে ভালবাসেন। অপর শ্রেণী সর্ব্বদাই ভবিষ্যতের দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছেন; ভবিষ্যতের মধ্যেই তাঁহারা বাস করেন, আশার চক্ষে ভবিষ্যৎকে দেখেন ও সেই দিকে স্বদেশ ও স্বজাতিকে লইতে চান। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শাক্য, যীশু, মহম্মদ প্রভৃতি এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। ইদানীংকালে রামমোহন রায় এই প্রকৃতিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। ইতিহাসে দেখা যায় এই প্রকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মানবমনের উপরে সমধিক প্রভাব হইয়া থাকে; কারণ, আশার অপেক্ষা ভাল জিনিষ আর নাই। যে মানুষকে আশা দেয়, সে-ই জীবন দেয়। যিনি বলেন, তোমরা এখন মলিন বটে, কিন্তু চিরদিন মলিন থাকিবে না, তোমাদের জন্য শুভদিন আসিয়াছে, চল, তদভি-মুখে অগ্রসর হই; তিনি আমাদের প্রকৃত বন্ধু। আমরা এরূপ সেনাপতির বিজয়-বৈজয়ন্তীর তলে দাঁড়াইতে ভালবাসি। এ জীবন যেন রণক্ষেত্রের ন্যায়, আমরা সহস্র প্রকার প্রতিকূলতার মধ্যে স্বীয় জীবনের আদর্শসাধনে নিযুক্ত রহিয়াছি; নিরন্তরই আশানিরাশার আন্দোলনে দুলিতেছি; বিষাদ ও অনুশোচনার যাতনা সহিতেছি; অতি বলবান্ হৃদয়ও এই কঠোর সংগ্রামের সময়ে শ্রান্তক্লান্ত হইয়া পড়ে। যখন আমরা নির্জ্জনে জীবনের ভারবহনে ম্লান ও ম্রিয়মাণ হই, তখন

যদি কোনও বলবান্ পুরুষের আশ্বাসজনক বাণী আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে, যদি শুনিতে পাই, একজন বলিতেছেন, অগ্রসর হও। অগ্রসর হও। ভয় নাই; জয়শ্রী সম্মুখে; তাহা হইলে আমাদের অবসন্ন মনে তাড়িত-প্রবাহ প্রবাহিত হয়; আমরা স্বতঃই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হই। এইরূপ বিক্রমশালী ও আশাপূর্ণ ব্যক্তিরাই মানবসমাজের নেতৃস্থান অধিকার করিয়া থাকেন। বিদ্যাসাগরের ন্যায় তেজস্বী পুরুষকে একবার দেখাও পরম লাভ; একবার দেখিলে তাহা চিরজীবনের শক্তির উৎস হইয়া থাকিতে পারে।

এই সকল চরিত্র জাতীয় সম্পত্তি। ইঁহাদিগকে জন্ম দিবার জন্য জাতিকে উচ্চ হইতে হয় এবং ইঁহারা জন্মিয়াও জাতিকে উচ্চ করিয়া তোলেন। ইঁহারা যখন অন্তর্হিত হন, তখন উত্তরাধিকারসূত্রে ইঁহাদের চরিত্র-সম্পত্তি পাইয়া আমরা ধনী হই। ইঁহাদের চরিত্রের গুণাবলী অজ্ঞাতসারে আমাদের আত্মার অস্থিমজ্জাতে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে উচ্চতর ভূমিতে লইয়া যায়। বিধাতার এই সত্যময় রাজ্যে এক কণা খাঁটি জিনিষও নষ্ট হয় না। যাঁহারা মননের দ্বারা জীবিত থাকেন, তাঁহারাই প্রকৃতভাবে জীবিত, তাঁহাদের চরিত্র জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিণত হয়। তাঁহাদিগকে লইয়াই জাতীয় গৌরব। যেমন হিমালয়ের পাদশৈলসকল ভাল করিয়া দেখা যায় না, কিন্তু চিরতুহিনাবৃত শৃঙ্গরাজি লক্ষিত হইতে থাকে, এবং হিমালয়ের মহত্ত্ব জ্ঞাপন করে, তেমনি অপর জাতিসকল

দূর হইতে এই সকল আসাধারণ পুরুষের আলোকমণ্ডিত মস্তক দর্শন করিয়া জাতিগত মহত্ত্ব অনুভব করিয়া থাকে। ইঁহাদিগকে বুঝিতে পারা এবং সমুচিত শ্রদ্ধা দিতে পারাও মহত্ত্বে উঠিবার সোপানস্বরূপ।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রের বিশিষ্টতা বর্ণনা করিয়া কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"বিদ্যাসাগর এই অকৃতকীর্ত্তি অকিঞ্চিৎকর বঙ্গসমাজের মধ্যে নিজের চরিত্রকে মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে প্রস্ফুট করিয়া যে অসামান্য অনন্যতন্ত্রত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাংলার ইতিহাসে অতি বিরল। এত বিরল যে, এক শতাব্দীর মধ্যে কেবল আর দুই একজনের নাম মনে পড়ে এবং তাঁহাদের মধ্যে রামমোহন রায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"

"যাঁহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের পরিমাণ অধিক, চিরাগত প্রথা ও অভ্যাসের জড় আচ্ছাদন তাঁহাদের সেই প্রবলশক্তিকে চাপা দিয়া রাখিতে পারে না। ইঁহারাই নিজের চরিত্রপুরীর মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রাপ্ত হন। অন্তরস্থ এই মনুষ্যত্বের স্বাধীনতার নামই নিজত্ব। মহৎ ব্যক্তিরা এই নিজত্ব-প্রভাবে একদিকে স্বতন্ত্র, একক; অন্যদিকে সমস্ত মানবজাতির সবর্ণ, সহোদর। আমাদের দেশে রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগর উভয়ের জীবনেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে যেমন তাঁহারা ভারতবর্ষীয়, তেমনি অপর দিকে য়ুরোপীয় প্রকৃতির সহিত তাঁহাদের চরিত্রের বিস্তর

নিকটসাদৃশ্য দেখিতে পাই। অথচ তাহা অনুকরণগত সাদৃশ্য নহে। বেশভূষায়, আচার ব্যবহারে তাঁহারা সম্পূর্ণ বাঙ্গালী ছিলেন। স্বজাতীয় শাস্ত্রজ্ঞানে তাঁহাদের সমতুল্য কেহ ছিল না। স্বজাতিকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের মূলপত্তন তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন। অথচ নির্ভীক বলিষ্ঠতা, সত্যচারিতা, লোকহিতৈষণা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং আত্মনির্ভরতায় তাঁহারা বিশেষরূপে য়ুরোপীয় মহাজনদের সহিত তুলনীয় হইতে পারেন। য়ুরোপীয়দের তুচ্ছ বাহ্য অনুকরণের প্রতি তাঁহারা যে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেও তাঁহাদের য়ুরোপীয়-সুলভ গভীর আত্মসম্মানবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।”

“আমরা বিদ্যাসাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার আধার বলিয়া জানি; এই বৃহৎ পৃথিবীর সংশ্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়া উঠিব, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব যে দয়া নহে, বিদ্যা নহে, বিদ্যাসাগরের চরিত্রের প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় **পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব** এবং যতই তাহা অনুভব করিব, ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে, এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।”

গ্রন্থকার প্রণীত

পুরস্কার ও গ্রন্থালয়ের পুস্তক